বিরজা।

(উপন্যাস।)

শ্রীতারকনাথ বিশ্বাস কর্ত্তৃক
প্রণীত।

কলিকাতা, বাগবাজার 'হ্লাদিনী' কার্য্যালয় হইতে
শ্রীরাজেন্দ্রলাল বিশ্বাস কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

কলিকাতা

১১৩ নং গ্রেষ্ট্রীট অন্নদা প্রেসে
শ্রীকৈলাসনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৪ সাল।

বিরজা।

—ঃঃ—

(উপন্যাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রেম সম্ভাষণ।

শতাব্দি বিগত হইয়াছে,—যখন বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যার রত্নময় সিংহাসনে বাদসাহ সিরাজ উদ্দৌলা আধিপত্য করিতেন, যখন সেই ঘোর নির্দ্দয় পাষণ্ডের অত্যাচারে বাঙ্গালা বেহার উড়িষ্যা রোদন করিত, আমরা সেই সময়ের একটী ঘটনা বিবৃত করিতে অগ্রসর।

গ্রীষ্মকাল, তপন দেব মনের সাধে পৃথিবীকে দগ্ধ করিয়া পশ্চিমাকাশে আপন রক্তিম লোচন বিস্তার করিতেছেন, যেন আশা মিটে নাই, আরও দগ্ধ করিতে ইচ্ছা আছে। বিহঙ্গমগণ, যেন বিদায়পর মার্ত্তণ্ডদেবের হৃদয় গত ভয়াবহ ভাব অবগত হইয়াই কাকলিসহ সভয়ে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে। ব্রততী মৃদু বাতাসে হেলিয়া দুলিয়া সহকার তরুকে প্রেমালিঙ্গন করিতেছে, মনের আশা মিটাইয়া লইতেছে। তরুশিরে প্রস্ফুটিত কুসুমরাজি যেন আপনাপন ক্ষণিক জীবনে পরিতৃপ্ত জানিয়া কাহারও বিষাদে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আপন মনে

হাসিতেছে। এমন সময়ে নন্দনপুরের প্রান্তবর্ত্তী ক্ষুদ্র তরঙ্গিণী তীরে ধীর পাদ বিক্ষেপে একটী যুবক উপস্থিত হইলেন, যুবক-টীর বয়ঃক্রম অনুমান বিংশতি বর্ষ, উন্নত নাসিকা, সুটান। ভ্রূযুগল, দীর্ঘচক্ষু, গঠনপারিপাট্য ও অঙ্গাবয়বের পরিপাট্য তাঁহার সৌন্দর্য্যের নিদর্শন স্বরূপ। কিন্তু কে জানে, এ সমস্ত সৌন্দর্য্যেও যেন কিসের অভাব ছিল, সে সুন্দর চক্ষু যুগলে সে পূর্ণ জ্যোতিঃ নাই, যৌবনের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি নাই, বদন বিরস। পণ্ডিতে বলেন, যে "লোকের দরিদ্রতা তাহার মুখভাবে প্রকাশ পায়।" আমরাও এ কথাটী স্বীকার করি, যুবকটীর মুখভাব পরীক্ষা করিলে এ বিষয় সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়!

যুবকটীর নাম অম্বিকাচরণ, অম্বিকাচরণের ইহ সংসারে কেহই নাই, মাতা ছিলেন তিনিও প্রায় দুই বৎসর অতীত হইল মৃতা হইয়াছেন, অম্বিকার অবস্থা অতি মন্দ, গোপাল-চন্দ্র গ্রামস্থ জমিদারের নায়েব, অম্বিকা তাঁহারই অধীনে চাকুরী করেন, যাহা কিছু পান তদ্দ্বারা কায় ক্লেশে দিনাতিপাত হয়। অম্বিকাচরণের বাল্যাবধি লেখাপড়ায় বড় মনোযোগ, ঈশ্বরে-চ্ছায় তাহার সফলতাও হইয়াছিল। অম্বিকা বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, কিন্তু সহায় নাই, সুতরাং লেখাপড়া শিখিয়াও তাহার কোন ফল দর্শে নাই, অম্বিকা মূর্খ নায়েবের অধীনে চাকুরী করিয়া দিনাতিপাত করেন।

অম্বিকাচরণ কিছুক্ষণ সেই অস্তগামী সুধাকর দীপ্ত ক্ষুদ্র প্রবাহিণীর বিমল বক্ষপ্রান্ত স্থিরদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন, পরে, নিশ্চিন্তভাবে ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, এমত সময়ে তথায় একটী রমণী আসিয়া উপস্থিত হইল, রমণীর

বয়ঃক্রম প্রায় চতুর্দ্দশ বৎসর—দেখিতে পাম রমণীর, বর্ণ পূর্ণোজ্জ্বল, বক্ষের ভাব অতি সুন্দর, মনোহর নাসিকা, দিব্যচক্ষু তাহাতে মধুর যৌবনের সুখময়ী লালিত্য—সুন্দরী, গ্রামস্থ জমিদারের নায়েব গোপালচন্দ্রের দুহিতা নাম—"বিরজা।"

রমণীটিকে দেখিয়া অম্বিকাচরণ যেন সহসা পূর্ব্বাপেক্ষা হর্ষোৎফুল্ল হইলেন, রমণী ধীর পাদ বিক্ষেপে তাঁহার নিকটে আসিলেন, উভয়ে অনেকক্ষণ—উভয়ের বদন প্রতি তাকাইয়া রহিলেন, বিরজা বলিলেন "তুমি দিন দিন এমন মলিন হচ্চ কেন?"

অম্বিকা। বিরজা! যে দুঃখী তাহার কি না সম্ভবে? আমি যদি মলিন না হব, তবে কে হবে?

বিরজা নিস্তব্ধ হইল, তাহার সেই সুন্দর চক্ষু বহিয়া দুই এক বিন্দু অশ্রু বিনির্গত হইল।

অম্বিকা। তুমি কাঁদ্‌চ?

বিরজা অধোবদন হইল, কোন উত্তর দিল না।

অম্বিকা। কেন বিরজা, কেন তুমি কাঁদ্‌চ?

বিরজা। তোমার অবস্থা দেখে।

অম্বিকা। দরিদ্রের শোচনীয় অবস্থা দেখে কি তোমার অন্তর কাঁদে?

বিরজা তাহার কোন উত্তর দিল না, নীরবে কাঁদিতে লাগিলেন।

"বিরজা কাঁদিতেছে" বলিয়া অম্বিকাচরণ বিরজার হস্ত ধারণ করিলেন, অম্বিকার প্রাণ যেন কোন অপ্রত্যাশিত প্রয়াণ করিল, বিরজা আবার একবার অম্বিকার প্রতি চাহিল, তাহার

নয়ন যুগল হইতে আবার প্রবলবেগে দর দর ধারে অশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। অম্বিকাচরণ সযত্নে বিরজার নয়ন বারি মুছাইয়া দিলেন। বিরজা ধীরে ধীরে আপন মস্তকটি অম্বিকাচরণের চিত্তোদ্বেলিত বক্ষে রক্ষিত করিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন অম্বিকাচরণের দারিদ্র্যনিপীড়িত চিত্তে যে কি অপূর্ব্ব ভাব ক্রীড়া করিতেছিল তাহা বর্ণনাতীত। তিনি নির্ব্বাক নিস্পন্দ ও কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইলেন, জগৎ ভুলিলেন, দারিদ্রতা ভুলিলেন, জগতের যাবতীয় ক্রুরতা বিস্মৃত হইলেন, হৃদয়াকাশে যে ঘোর ঘনঘটা এতকাল বিরাজ করিয়াছিল, তাহা অপনিত হইল, সুখদ শারদীয় পূর্ণ শশাঙ্ক যেন তাহার শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল, সে শোভা অপূর্ব্ব, যে শোভার প্রভাবে দীন সাম্রাজ্য পায়,—আজি দৈবানুগ্রহে দরিদ্র অম্বিকাচরণ সেই দেবতা-বাঞ্ছিত সাম্রাজ্যের অধিকারী। এখন এ কুটিল বিশ্ব সংসারে আর তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী কে? আমরা বলি অম্বিকাচরণ তুমি ধন্য, এখন তোমার দারিদ্র্য অনেকের স্পৃহনীয়, যাহার স্বপ্নের সফলতা হয়, তাহার তুল্য সুখী এ সংসারে আর কে আছে?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আশার অঙ্কুর।

নন্দনপুরের জমিদার মহাশয়ের নাম উমাচরণ। উমাচরণের পিতার তিনি একমাত্র পুত্র। যৌবনকালে উমাচরণের চরিত্র ভাল না থাকায় তাঁহার সমস্ত বিষয় বিভব তদীয় পৌত্র বিজয়কৃষ্ণের নামে উইল করিয়া যান। উমাচরণ নামেও কার্য্যে জমিদার বটেন, কিন্তু বিষয় সম্পত্তি সমস্তই তাঁহার পুত্র বিজয়কৃষ্ণের। উমাচরণ অত্যন্ত দুর্দ্দান্ত জমিদার ছিলেন, তাঁহার প্রতাপে প্রজাবর্গ শশঙ্কিত, কথায় বলে "বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়" বস্তুতঃ ইহার জমিদারিতে তাহাই ছিল। যদিও উমাচরণ রাজ সরকার হইতে রাজসম্মান সূচক কোন উপাধি প্রাপ্ত হয়েন নাই, তথাপি তাঁহাকে লোকে "রাজা বাহাদুর" বলিত। তিনিও মনে মনে আপনাকে রাজা বলিয়া জানিতেন।

জমীদার বা রাজা বাহাদুরের বাটী নন্দনপুরের এক প্রান্তভাগে, বাটীটী সেকেলে ধরণের, কিন্তু বৃহৎ—সদর অন্দর প্রায় একত্রেই, চতুর্দ্দিকে দিঘল চক্। বাটীর মধ্যে উমাচরণ বাবুর স্ত্রী, তাঁহার ভগ্নী, তিনি বিজয়কৃষ্ণ, এতদ্ব্যতীত আত্ম সম্পর্কীয় আর কেহ ছিলেন না।

মনুষ্য চিরদিন আপনার ভাগ্যলিপির প্রসন্নতা গণিয়া থাকে, অধিক কি তৎসম্বন্ধীয় স্বপ্ন দর্শনেও সুখানুভব করে, এই অমোঘ প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যতিক্রম করা যখন মানব মাত্রেরই সাধ্যায়ত্ত নহে, তখন গোপাল চন্দ্র যে তাহার বিপর্য্যয় করিবেন, ইহা স্বপ্ন বা ঘোর দুরাশা মাত্র। গোপাল চন্দ্রের সাধের

দুহিতা বিরজা অম্বিকাকে ভালবাসে, ইহা অপেক্ষা অধিক দুষ্কর্ম্ম বা পাপের কার্য্য আর কি হইতে পারে? পণ্ডিতে আত্মসমর্পণ সৌভাগ্যের বিষয়, কিন্তু সংসার বলিতেছে পণ্ডিত হইলে কি হইবে, যাহার অর্থ নাই সে কি মনুষ্য? সে কি কখন প্রেমিক পদ বাচ্য হইতে পারে?—আমাদের গোপাল চন্দ্রেরও সেই ধারণা, বিরজার এই অসঙ্গত অলৌকিক আত্মসমর্পণ তাঁহার হৃদয় জর্জ্জরিত করিয়াছিল, তিনি তাহার প্রদাহনে অস্থির হইতেছিলেন।

গোপালচন্দ্রের আশা বড় উচ্চ ছিল, তিনি মনে করিতেন বুঝি বিরজার তুল্য সুন্দরী আর দ্বিতীয় নাই, বস্তুতঃ গোপালের ধারণা নিতান্ত অলীক নহে। তাঁহার ধারণা ছিল, বিরজা রাজরাণী হইবার উপযুক্ত, তবে একটী রাজা খুঁজিয়া মিলেনা, কিন্তু তথাপি গোপাল তাঁহার আশালতার মূলে অবিরত আশা-বারিসিঞ্চন করিতেন।

মনুষ্য একটী সূত্র ধরিয়া আশার অঙ্ক পাত করে। সুতরাং আমাদের বিচক্ষণ নায়েব মহাশয়ের আশা যে সূত্রহীন তাহা কি করিয়া বলিব?—কিন্তু সেই সূত্রটী কি? নন্দনপুরের লব্ধপ্রতিষ্ঠ জমিদার, যাঁহাকে লোকে রাজা বলিয়া জানিত, তাঁহার শিবর নামে একটীমাত্র পুত্র, তাহা বোধ হয় পাঠক অবগত আছেন। তিনি অবিবাহিত। কিন্তু উমাচরণ যে তাঁহার একমাত্র পুত্রের সামান্য নায়েবের কন্যার সহিত বিবাহ দিবেন ইহা কি সম্ভব? কিন্তু গোপাল ভাবিত সম্পূর্ণ সম্ভব। গোপাল রামচন্দ্র জন্মাইবার পূর্ব্বে রামায়ণ প্রকটনের ন্যায় স্বীয় ভবিষ্যত সফলতার একটী সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়া-

ছিলেন। তিনি বিজয়ের চরিত্র বেশ জানিতেন, অর্থ সম্পন্ন জমীদারের মূর্খ পুত্র যে প্রাকৃতিক নিয়মের অন্তর্ভূত, বিজয়ও যে সেইরূপ তাহা স্বীকার্য্য। গোপালচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন যে বিজয় যদ্যপি, কোন প্রকার উত্তেজনার বশবর্ত্তী হইয়া একবার বিরজার রূপে মুগ্ধ হয় তাহা হইলেই তিনি স্বকার্য্য উদ্ধার করিবেন। বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করাইবেন। তাঁহার এ বিবাহে উমাচরণ বাবু বিরক্ত হইলেও কোন বিশেষ ক্ষতি নাই, তিনিই তখন সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিবেন, বিজয় সাবালক, মনে করিলেই পিতৃ হস্ত হইতে বিষয় বাহির করিয়া লইতে পারিবে। বস্তুতঃ গোপালের এই আশাই দৃঢ়রূপে তাহার হৃদয়ে ভিত্তি স্থাপনা করিয়াছিল, এবং তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এ আশা নিশ্চয়ই ফলবতী হইবে। এবং এই আশাতেই, বিজয়কে উত্তেজিত করিয়া, অনাথ, সহায় শূন্য, অন্নহীন অম্বিকাচরণের সর্ব্বনাশ করিতে কৃতযত্ন হইয়াছেন।

বেলা প্রায় অবসান, সূর্য্যের স্তিমিত কিরণ কাঁপিয়া কাঁপিয়া ভূমি হইতে ক্রমশঃ বৃক্ষ শাখা, তথা হইতে আরও ঊর্দ্ধে, এইরূপে ক্রমান্বয়ে আকাশে উঠিতেছে, এমত সময়ে এইরূপ দুর্ব্বা দুশ্চিন্তা সহচরী সমভিব্যাহারে গোপালচন্দ্র কত প্রকার কত কৌশল চিন্তা করিতে করিতে কার্য্যস্থান হইতে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, বিজয় একাকী সেই পথে মৃদুপাদ বিক্ষেপে বিচরণ করিতেছেন। বিজয়ের বয়ঃক্রম অনূ্যন ঊনবিংশতি বর্ষ দেখিতে বেশ সুশ্রী,—কিন্তু শীর্ণ, যৌবনের যথেচ্ছ অপব্যয়ে সাধারণতঃ যুবকেরা যেরূপ হইয়া থাকে, ইনিও

তদ্রূপ হইয়াছেন। গোপাল তাঁহাকে দূর হইতে চিনিলেন, মনে মনে বলিলেন "জগদীশ্বর আমাকে এমন দিন কবে দিবেন যে দিন বিজয়কে জামাতা বলিয়া সম্বোধন করিয়া প্রাণ জুড়াইব" গোপালের চক্ষে প্রকৃতই আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হইল,—একবার পশ্চাৎ ফিরিয়া বিজয়ের বাটির দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, সুধাধবলিত প্রকাণ্ড অট্টালিকা তাঁহার নয়ন পথে পতিত হইল, মনে মনে বলিলেন "বিরজা, তুই এই অমরাবতীতে বিরাজ করিবি, নন্দনকাননের প্রস্ফুটিত পারিজাত হইবি, ইহা কি কম সৌভাগ্যের কথা।" তখনই আবার হতভাগ্য অম্বিকাচরণের বিষণ্ণমূর্ত্তি তাঁহার হৃদয় পটে স্থান পাইল, হৃদয়ে কে যেন অগ্নিকুণ্ড জালিয়া দিল, দন্তে দন্ত ঘর্ষিত হইল। এমত সময়ে গোপাল বিজয়ের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন, বলিলেন "আজ যে এ দিকে!"

বিজয়। তোমার মেয়েকে দেখতে।

গোপালচন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিলেন "আমার পরম সৌভাগ্য যে আমার কুটিরে আপনার পদার্পণ হবে।"

উভয়ে চলিলেন, গোপাল বিজয়ের সহিত নানা কথা কহিতে লাগিলেন, ক্রমশঃ বাটিতে উপস্থিত হইলেন। গোপাল তাঁহার বাটির সম্মুখে একটি সুন্দর বাগান প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা বিজয়কে দেখাইলেন। বিজয় তাহার পারিপাট্যের বিস্তর প্রশংসা করিলেন। তথা হইতে তাঁহাকে বাটির মধ্যস্থ উপরের ঘর—যে ঘরে বিরজা বসিয়া ছিল, তন্মধ্যে লইয়া গেলেন, তথায় একটি সুন্দর পরিষ্কার শয্যা ছিল, গোপালচন্দ্র অতি সমাদরে বিজয়কে তাহাতে উপবেশন করাইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

—::—

বিজয়চন্দ্র।

সহসা কক্ষমধ্যে বিজয়কে দেখিয়া বিরজা লজ্জাবনত মুখী হইয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রস্থান করিল। বিরজার দাসী তাহার অনুসরণ করিল। বসন্ত যৌবনা স্থিরা সৌদামিনীরূপা বিরজাকে দেখিয়া বিজয়ের মন যে বিচলিত হইল তাহাতে সন্দেহ নাই, বিজয় বিমূঢ়ের ন্যায় গৃহান্তর গমনপর বিরজার প্রতি এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। বিরজার অপূর্ব্ব মুখশ্রী একবার মাত্র বিজয়ের কলুষিত নয়ন দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, তাহাতেই যেন কি বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়াবলে তথায় তাহা অঙ্কিত হইয়াগেল। গোপালচন্দ্র সকল বিষয়েই বিচক্ষণ, তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যেই বিজয়ের হৃদয়গত ভাব অবগত হইয়া মনে মনে তাঁহার মনোরথ সিদ্ধির সম্ভাবনা গণনা করিয়া পুলকিত হইলেন।

গোপাল বিরজাকে গৃহান্তরে গমন করিতে দেখিয়া বলিলেন "বিরজা এদিকে এস, ওঁকে লজ্জা কি?"

বিরজা আসিল না।

বিজয়। তোমার কন্যাটী পরমা সুন্দরী।

গোপাল "আজ্ঞা হাঁ" বলিয়া আবার বিরজাকে বলিলেন" "মা এস, এদিকে এস।"

বিরজা তথাপি আসিল না।

বিজয়। তাইত এযে বড় লজ্জা।

গোপাল। বিরজা! কথা শুন্‌চনা?

বিরজা লজ্জাবনতমুখী হইয়া দ্বার দেশে অধোবদনে দণ্ডায়মানা হইল, আবার বিজয় নির্নিমেষ লোচনে সেই সুধাময়ীর রূপবিভা অবলোকন করিয়া নয়ন পরিতৃপ্ত করিতে লাগিলেন।

বিরজার মুখে কথা নাই, নির্ব্বাক, নিস্পন্দ। গোপাল চন্দ্র এমত সময়ে কোন কার্য্যের ভাণ করিয়া নিচেয় গেলেন, সেই সঙ্গে দাসী বিজলীকেও ডাকিয়া লইয়া গেলেন।

বিরজাও যাইবার উপক্রম করিল, কিন্তু গোপালচন্দ্র রাগভরে কহিলেন "উঁনি কি একলা থাকিবেন, তুমি একটু থাক্‌তে পার না।"

বিরজার চক্ষু সজল হইল, দুই এক বিন্দু উষ্ণ অশ্রুবারি ধীরে স্খলিত হইয়া মৃত্তিকা স্পর্শ করিল। বিরজা দাঁড়াইল।

বিজয় গাত্রোত্থান করিয়া বিরজার হস্ত ধারণ করিলেন; বিরজার তাহা সহ্য হইল না, সে সজোরে স্বীয় হস্তাকর্ষণ করিয়া সরোদনে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

এই আকস্মিক ঘটনায় বিজয় কিছুমাত্র অপ্রতিভ হইলেন না, দ্বারের পশ্চাৎভাগে গোপালচন্দ্র গুপ্তভাবে তাঁহাদের কথা বার্ত্তা শুনিবার জন্য দণ্ডায়মান ছিলেন। বিরজাকে প্রস্থান করিতে দেখিয়া তিনি রোষভরে অগ্রসর হইয়া বলিলেন "পাজি মেয়ে, যাঁর খেয়ে এত বড়টা হলি তাঁর কথা শুনিস্‌ নে। তোর সৌভাগ্য যে উঁনি তোকে বিবাহ কর্ত্তে চেয়েছেন।" বিজয়ের দিকে ফিরিয়া কহিলেন" বিরজা বালিকা, আপনি ওর কথায়

কিছু মনে করিবেন না। আপনার প্রস্তাব আমার শিরোধার্য্য।"

বিজয়। তবে আমি এখন আসি?

গোপাল কুণ্ঠিতভাবে বলিল "বলতে পারিনে, জলখাবার আয়োজন হয়েছে, যদি—"

বিজয় গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন" না, না, আজ নয়, আর এক দিন হবে।"

গোপালচন্দ্র আর কোন কথা কহিতে পারিলেন না। বিজয় ধীর পাদ বিক্ষেপে বিরজার অপূর্ব্ব রূপ মাধুরী ভাবিতে ভাবিতে প্রস্থান করিলেন। গোপাল বাটীর বহির্দ্দেশ পর্য্যন্ত তাঁহার অনুসরণ করিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

—::—

প্রিয় সম্মিলন।

আবার সন্ধ্যা কাল,—যে সময়ে প্রণয়ীর হৃদয়ে প্রেমের প্রকৃতি বৃত্তি সমধিক জাগরিত হয়, যে সময়ে প্রেমের বিলাস-ক্ষেত্রে নবমল্লিকা প্রস্ফুটিত হয়, সেই সুখদ সময়ে, সেই

পূর্ব্বস্থানে, আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত প্রণয়ীদ্বয় সম্মিলিত। কিন্তু পাঠক! মনে করিবেন না যে উভয়ে প্রেমের লহরী লীলায় লীন। হায় দরিদ্রতা, তোমার নিকট কি প্রণয়ীরও অব্যাহতি নাই?—প্রণয়ের অনন্তসুখ ইহাও কি তোমার অভাবে অলিক স্বপ্ন?

প্রণয়ীদ্বয় অনেকক্ষণ নিস্তব্ধভাবে রহিলেন, পরে অম্বিকা বলিলেন "বিরজা! তুমি আমায় ভাল বাসিয়া আপন সুখ নষ্ট করিলে?"

বিরাজা সোৎসুকভাবে কহিল, "কেন অম্বিকা?"

অম্বিকা। দেখ বিরজা, আমি এমন অমূল্য নিধি রত্নের সুখৈশ্বর্য্য হাতে পাইয়াও সুখানুভবে অসমর্থ; একে দরিদ্রতা—মর্ম্মভেদী দারিদ্রতা, তদুপরে নৃশংস অপমানের ভয়ঙ্কর বিষে জর্জ্জরিত। বিরজা, এ দরিদ্রের উষর হৃদয়ক্ষেত্রে কি প্রেমাঙ্কুর প্রস্ফুটিত হওয়া বিধাতার অভিপ্রেত হইতে পারে?

অম্বিকার চক্ষে জল আসিল। বিরাজা অম্বিকার চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া কহিলেন, "অম্বিক! কাঁদিও না, তোমার এক বিন্দু অশ্রুজল আমার হৃদয়ে উত্তপ্ত তরল লৌহ ঢালিয়া দেয়, আমি সকল সহ্য করিতে পারি, কিন্তু তোমার চক্ষের জল দেখিতে পারি না।"

অম্বিকা। বিরজা, প্রাণাধিকে বিরজা! আমি বামন হইয়া চন্দ্রস্পর্শ করিয়াছি, কিন্তু প্রিয়ে! তুমি কি মনে কর যে তুমি আমার হইবে, ইহা কি সম্ভব? তোমার পিতা কি আমার হস্তে তোমার ন্যায় অমূল্য কহিনূর সমর্পণ করিবেন?

বিরজা চক্ষের জল মুছিয়া বলিল "প্রাণাধিক! কি জাগ্রতে কি নিদ্রায়, কি স্বপ্নে, তুমিই আমার আ রাধ্য দেবতা, আমি এ জীবনে আর কাহারও হইব না, ইহাতে আমার মৃত্যু হয় তাহাও শ্রেয়।"

অম্বিকার চক্ষুদ্বয় যেন ঈষৎ উজ্জ্বলতর হইল, বলিলেন "বিরজা! তুমি রমণীকুলের রত্নভূষণ, প্রণয়ের মূর্ত্তিমতী দেবী—বিরজা, প্রাণাধিকে বিরজা—বিবাহের কথা দূরে থাকুক, তোমার পিতা হয়ত আমাকে নিরাপরাধে আমার কার্য্য হইতে অবসৃত করিবেন। প্রাণাধিকে, তাহা হইলে আমার দশায় কি হইবে ভাব দেখি? আমি হয়ত উদরপূর্ণ অন্নের জন্য লালায়িত হইব, হয়ত দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে বাধ্য হইব।"

বিরজা। কেন তোমার চাক্‌রী যাবে?

অম্বিকা। সে অনেক কথা।

অম্বিকাচরণের চক্ষু ফাটিয়া জল পড়িতে লাগিল, প্রেমময়ী বিরজা স্বীয় বসনাঞ্চল দ্বারা তাহা মুছাইয়া দিয়া বলিল "তবে কি আমি পিতাকে তোমার নিমিত্ত বলিব?"

অম্বিকা। না বিরজা! একথা তুমি তাঁহার নিকট প্রকাশ করিও না। ইহাতে সুফলের পরিবর্ত্তে কুফল ফলিবে, এই হইবে যে তোমায় মধ্যে মধ্যে দেখিয়া যে সুখানুভব করিতাম, যে অনন্ত আশ্বাসে হৃদয়কে বদ্ধ করিতাম, তাহার মূলে কুঠারাঘাত করা হইবে, আমাদের সমস্ত আশা, সমস্ত ভরসা একবারে বিলুপ্ত হইবে।

উভয়ে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ ও বিমর্ষভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন,

কাহার মুখে কথা নাই, কিন্তু উভয়েরই চক্ষু দিয়া নীরবে অশ্রুবারি নিপতিত হইতেছে। এমত সময়ে তথায় সহসা গোপালচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোপাল চন্দ্রকে দেখিয়া উভয়ে যে কতদূর ভীত ও আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। উভয়ের তালু শুষ্ক হইয়া আসিল, পাদদ্বয় কাঁপিতে লাগিল। গোপাল চন্দ্র চক্ষুদ্বয় আরক্তিম করিয়া কহিলেন, "বিরজা এ কি!"

বিরজা। নির্ব্বাক নিস্পন্দ।

গোপাল। কোথায় তোমায় রাজরাণী করিতে কৃতসংকল্প, না তুমি একটা কাঙ্গালের সহিত প্রেমালাপ করিতেছ, তোমায় ধিক্ আর আমার জীবনেও ধিক্; আমার কন্যার যে এরূপ নীচ প্রবৃত্তি হইবে, ইহা স্বপ্নেও জানিতাম না।

কাহারও বাকস্ফূর্ত্তি নাই। উভয়ের চক্ষুই মৃত্তিকা সংলগ্ন।

গোপাল। অম্বিকে, তোর কি সাহস যে তুই আমার কন্যার পাণিগ্রহণে অভিলাষ করিস্—তোর আবার বিবাহের সাধ, আপনি খেতে পাসুনে স্ত্রীকে খাওয়াবি কি?

অম্বিকা। আপনি অন্যায়—"

গোপাল। রেখে দে তোর অন্যায়, তোর কথা শুন্‌লে আমার হাড় জলে যায়, ফের যদি কথা কবি, তা হলে জুতিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেব, পাজি—ছুঁচো।

অম্বিকা কাঁদিতে লাগিলেন।

গোপাল। আজ থেকে তোর চাকুরি গেল, কিন্তু তুই একেবারে এ দেশ ছেড়ে যাবি, যদি না যাস, তো হলে দেখ্‌বি তোর কি হয়। তোর দুঃখে শেয়াল কুকুর কাঁদবে!

অম্বিকা নিস্তব্ধভাবে অশ্রুপূর্ণলোচনে দণ্ডায়মান রহিলেন। গোপাল বিরজার হস্ত ধারণ করিয়া সজোরে টানিয়া বলিলেন, "ফের যদি কখন এমন দেখি, তা হলে মেরে ফেল্‌ব। চল, তোমার বেরুনো বার কর্‌বো, এই বুঝি তোমার নদীতে গা ধুতে আসা?"

গোপাল বিরজাকে টানিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন।

অম্বিকা যতক্ষণ বিরজাকে দেখা যাইতে লাগিল, ততক্ষণ অনিমেষলোচনে তাহার প্রতি চিত্রার্পিত পুত্তলিকাবৎ চাহিয়া রহিলেন, ক্রমশঃ বিরজা দৃষ্টির বহির্ভূত হইল, তাঁহার হৃদয়ে কে যেন গাঢ় মসি ঢালিয়া দিল। তিনি আকুল নয়নে একাকী নির্জ্জনে কাঁদিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার হৃদয় হইতে দারিদ্র্যের তামসীমূর্ত্তি অপসৃত হইল, বিরজা যে আর তাঁহার হইবে না, তখন ইহাই তাঁহার দুঃখ, এ দুঃখের নিকট সকল দুঃখ পরাস্ত হইল।

অম্বিকাচরণ অনেকক্ষণ অবসন্নভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন, আপন ললাটকে শত ধিক্কার দিলেন, পরে চক্ষের জল মুছিয়া বিরস হৃদয়ে তথা হইতে ধীর পাদবিক্ষেপে প্রস্থান করিলেন। যেন কত দুর্ব্বল, যেন কত বার দুর্দ্দম পীড়ার অসহ্য যাতনা সহ্য করিয়াছেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—:০:—

অপকারের শেষ।

উক্ত ঘটনার পরদিবস আবার বিজয়চন্দ্র আসিলেন, কিন্তু সে দিনও বিরজা তাঁহার সহিত কোন কথা কহিলেন না, বস্তুত এ সকল তাহার পিতার সহ্য হইতে ছিল না। বিজয়চন্দ্র প্রস্থান করিলে, গোপাল আপন কক্ষে প্রবেশ করিয়া সেই ভগ্ন-হৃদয়া একমাত্র দুহিতাকে অন্যায় তিরস্কার করিতে ক্রটী করিলেন না। গোপালচন্দ্র স্ত্রীলোককে সংসারের জীব মধ্যেই গণ্য করিতেন না, স্ত্রীলোকের মতামত নাই, ইহাই তাঁহার ধ্রুব বিশ্বাস ছিল। স্ত্রীতে কেহ অধিক অনুরক্ত হইলে, তাঁহাকে স্ত্রৈণ বলিয়া বিদ্রুপ করিতেন, স্ত্রী না থাকায় গোপালচন্দ্রের এই ধারণা ও সাহস বৃদ্ধি পাইয়াছিল কি না, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু স্ত্রীলোক জগতের কেহই নহে, ইহাই তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সূক্ষ্মফল!

স্ত্রীলোক বুঝে না, সুতরাং বিরজা বুঝিবে কি প্রকারে? বিরজা যে আপনার সুখ দুঃখ বুঝে না, ইহা গোপালচন্দ্রের বড় দুঃখ। কোথায় রাজরাণী হইবে, তিনি রাজশ্বশুর হইবেন, ইহাতে তাহার অনিচ্ছা, অথচ আশ্রয়হীন, সহায়, সম্পত্তিশূন্য অম্বিকাচরণকে ভালবাসিতে, বিবাহ করিতে, বিনামূল্যে তাঁহার চরণে ইহ জন্মের তরে বিকাইতে প্রস্তুত। কিন্তু এ কথা কি কেহ শুনে? স্বার্থে পরিবর্দ্ধিত আশালতার মূলে কে এমন অন্ধ আছে যে কুঠারাঘাত করে? যদি করে

সে সংসারী নয়,—নররূপী দেবতা! কিন্তু ভূতে কখন মানুষ হয়? মানুষ ভূত হইতে পারে। গোপাল আমাদের সেই কিম্ভূত কিমাকার ভূত, সে স্বার্থান্ধ। গোপাল দেখিলেন যে আমানিশাকাশে প্রকৃতই পূর্ণ শশধর সমুদিত, তাঁহার সাধের চাঁদাগাছে সভাই কুঁড়ি ধরিয়াছে! বিজয়ের মন যে ভিজিয়াছে তাহা তিনি বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। কিন্তু উপায়? হতভাগিনী বিরজা ত বিজয়কে চায় না, রাজসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়া পর্ণকুটিরে বাস তাহার অভিপ্রেত; রাজার পুত্র বিজয়কে উপেক্ষা করিয়া পথের ভিখারি অম্বিকাচরণে আশক্ত।

গোপালচন্দ্র ভাবিলেন স্ত্রীলোকের হৃদয় দর্পণবৎ, যাহা সম্মুখে থাকে, তাহাই প্রতিবিম্বিত হয়, সুতরাং ঘনিষ্ঠতা কমিলে তাহা আর থাকে না! চাকরিটী না থাকায় অম্বিকার স্বাধীন বৃত্তিটুকু গিয়াছে, বা দু দিনে যাইবে, কিন্তু বিরজার ত তাহাতে মানসিক পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। এখন কর্ত্তব্য কি? অম্বিকাকে বিরজার নয়নান্তরাল করা আবশ্যক, তাহার উপায় কি? সহসা অম্বিকাকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে, কোন উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হইয়াছে। গোপাল কয়েক দিন সেই উপায় চিন্তায় গাঢ়নিরত রহিলেন। বিজয়চন্দ্রের সহিত সেই অবধি বেশ মাখামাখি হইয়াছে, গোপাল যাহা বলেন বিজয় এখন তাহাই শুনেন। অতি অল্পদিন মধ্যেই গোপাল বুদ্ধি পাকাইয়া তুলিলেন, অম্বিকার উপর কোন গুরুতর মিথ্যা অভিযোগ অর্পিত করাই স্থির হইল। সে অভিযোগ কি? এ সম্বন্ধে বিজয়ের পরামর্শ লওয়া হইল, শেষ।

রটনা করা হইল যে " অম্বিকা রাজকুমার বিজয়ের পরম শক্র, তাঁহাকে হত্যা করিবার চেষ্টায় আছে" এই রটনা মূহুর্ত্ত মধ্যে দেশময় রাষ্ট হইল, বিজয়ের পিতার কাণে গেল, তিনি তখন অম্বিকাকে বাঁধিয়া আনিতে হুকুম দিলেন।

আমরা যে সময়ের কথা বিবৃত করিতেছি, সে সময়ে মুর্শিদাবাদের নবাবই সকল রাজা ও জমীদারের শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। বিজয়ের পিতা উমাচরণের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় না থাকিলেও নবাববাহাদুরের নিকট যে উমাচরণের প্রতিপত্তি ছিল তাহা স্বীকার্য্য। গোপালচন্দ্রের প্রখর যুক্তিতে স্থির হইল যে অম্বিকাকে মুর্শিদাবাদে পাঠান হউক, নবাব বাহাদুর যেরূপ দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিবেন তাহাই সকলের নিঃসন্দেহ অনুমোদনীয় হইবে। সকলে একমত হইয়া তদণ্ডেই হতভাগ্য অম্বিকাকে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করিলেন। তখন বেলা দুই প্রহর অতীত প্রায়, কিন্তু সেখানে এমন কেহ ছিল না, যে অম্বিকার আহারাদি হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করে আমরা নিশ্চয় জানি অম্বিকার তখনও আহারাদি হয় নাই। ভাগ্যহীন নির্দ্দোষী অম্বিকা সুনির্ম্মল হৃদয়ে দুর্নিবার্য্য হৃদয়গত উত্তেজনার বশীভূত হইয়া বিরজাকে ভাল বাসিয়া মহাপাপ করিয়াছে, আজি সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখর রৌদ্রে, অনশনে, বন্দীভাবে, মুর্শিদাবাদাভিমুখে রক্ষিবর্গ সমভিব্যাহারে চলিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

—::—

দুঃখে সুখ।

অম্বিকাচরণ প্রস্থান করিলে গোলাপচন্দ্র বলিলেন, "এ মোকর্দ্দমার তদ্বির করিতে আমার মুর্শিদাবাদ যাওয়া বিধেয়।"

উমাচরণ বলিলেন "তাহাতে সন্দেহ কি? কল্য প্রত্যুষে রওনা হইবে, বেহারাদিগকে বলিয়া রাখ যেন তাহারা প্রস্তুত থাকে।"

গোপাল। যে আজ্ঞা।

উমা। যাহাতে ও পাজি আর এ দেশে না আসিতে পারে তাহা যেন করা হয়।

গোপাল। তাহাত করা চাই-ই।

উমা। অর্থ ব্যয়ের জন্য কুণ্ঠিত হইও না, প্রধান কাজিকে হাত করিবে, নবাব ত কিছুই দেখেন না।

পাঠক! আসুন আপনাকে ঠিক এই সময়ের আর একটী ঘটনারি কথা বলি, এখানে গোপালচন্দ্রের রাজার সহিত যে সময়ে কথাবার্ত্তা হইতেছে, সেই সময় তাঁহার বাটীর পার্শ্ববর্ত্তী পথে একটি শোচনীয় ঘটনা ঘটিয়াছে।

রক্ষীগণ অম্বিকাচরণকে মুর্শিদাবাদ লইয়া যাইবার সময় গোপালচন্দ্রের বাটীর পার্শ্ব দিয়া যে পথ গিয়াছে সেই পথ দিয়া লইয়া যাইতেছিল, তাহারা যদ্যপি ভিতরের কথা জানিত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সে পথ দিয়া লইয়া যাইত না, কিন্তু দৈব ঘটনা প্রযুক্ত এ কথা কেহ জানে না।

পাঠক! বোধ হয় অবগত আছেন যে গ্রামের এক প্রান্ত-ভাগে গোপাল চন্দ্রের বাটী, গোপালের বাটির পার্শ্ববর্ত্তী পথটি অতি নির্জ্জন; প্রায়ই সে পথ দিয়া লোকের যাতায়াত নাই, আজি সেই পথ দিয়া রক্ষীগণ অম্বিকাকে লইয়া যাইতেছে। অম্বিকার বদন বিশুষ্ক, মুখভাব মলিন ও বিষাদ সূচক, অম্বিকা-চরণ বেশ বুদ্ধিমান ছিলেন, তাঁহার যে একটা কোন বিশেষ অনিষ্ট ঘটিবে তাহা তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন। অম্বিকা গোপালের বাটীর নিকটস্থ হইয়া যেন তাঁহার সকল দুঃখ বিস্মৃত হইলেন. মনে করিলেন "হে ভগবান, এসময়ে যদ্যপি এক-বার বিরজাকে দেখাও তাহা হইলে বোধ হয় আমার সকল দুঃখ নিবারণ হয়. আমি সকল কথা ভুলিয়া যাই।" কিন্তু ঈশ্বর কি দরিদ্র অম্বিকার কথা শুনিবেন?

অম্বিকা বিষণ্ণ অন্তরে, উদ্বিগ্ন চিত্তে এক দৃষ্টে গোপালের বাটীর নিকট গেলেন, বাটী শেষ হয়, যে আশার দামিনী ছটা মধ্যে মধ্যে অম্বিকার বিষাদরূপ তমসাচ্ছন্ন হৃদয়ে মৃদু আলোক বিকীর্ণ করিতেছিল, তাহা বুঝি স্থির হয়,—অম্বিকার হৃদয় বিদীর্ণ প্রায় বিরাজকে হয়ত আর দেখিবেন না, তাঁহার সমস্ত আশার মূল, মূর্ত্তিবতী প্রেমরূপিনী বিরজাকে আর দেখিবেন না, এদুঃখ কি রাখিবার স্থান আছে, অম্বিকার চক্ষু এতক্ষণ শুষ্ক ছিল, এখন সজল হইল, যে হৃদয় ক্ষণে ক্ষণে আশার তরঙ্গে উদ্বেলিত হইতে ছিল, তাহা যেন মন্দিভূত হইয়া আসিতে লাগিল। এমত সময়ে সহসা খিড়কীর দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, একটি অপরূপ রূপময়ী স্থিরযৌবনা রমণী আলুলায়িত কেশে, বিগলিত বেশে, দৃষ্টিহীন নয়নে উন্মাদিনীর ন্যায়

অম্বিকাকে আলিঙ্গন করিয়া সরোদনে বলিল "প্রাণেশ্বর! অম্বিকা, কোথায় যাও, আমায় কোথায় ফেলিয়া যাও।"

দূরে প্রতিধ্বনি যেন বিদ্রূপ করিয়া বলিল "আর কোথায় যাও।"

অম্বিকাচরণ জ্ঞান শূন্য স্তম্ভিতের ন্যায় বিরজাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "বিরজা!"

চক্ষু জলে উছলিল, কণ্ঠরোধ হইল।

বিরজা একদৃষ্টে অম্বিকার প্রতি চাহিয়া সরোদনে কহিল "অম্বিকা।"

অম্বিকা। কেন বিরাজ?

বিরজা। তুমি কোথায় যাও, আমায় লইয়া চল।

অম্বিকা। তুমি কোথায় যাইবে বিরজা?

বিরজা। তুমি যেখানে যাইবে।

অম্বিকা। আমি কোথায় যাইব, তাহার স্থির কি, হয়ত যমালয় আমার নির্দ্দিষ্ট স্থান।

বিরজা সদন্তে কহিল "না হয় আমারও তাহাই হইবে।"

অম্বিকা সস্নেহে বিরজার চিবুক স্পর্শ করিয়া বলিলেন "এখন আসি. যদি বাঁচিয়া থাকি, যদি কখন ঈশ্বর মুখ তুলিয়া চান, তবে দেখা হইবে, নতুবা এই শেষ! তোমার পিতা যদ্যপি এখন আসিয়া পড়েন তাহা হইলে আরও অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা।"

রক্ষীগণ এতক্ষণ চিত্রার্পিত পুত্তলিকাবৎ নিশ্চেষ্টভাবে দণ্ডায়মান ছিল, তাহাদের হৃদয়েও দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল,

"গোপালচন্দ্র যদি আসে।" এই ভাবিয়া তাহাদের সে জ্ঞান তিরোহিত হইল, বলিল "আয় নয় চল।"

অম্বিকা। বিরজা তবে আসি।

বিরজা অঘোরে কাঁদিতে লাগিল, তরল হৃদয়ের সে প্রবল শোকের বিষয় বর্ণনা করা দুষ্কর, বলিল, "হায় এই হত-ভাগিনীই তোমার সমস্ত দুঃখের কারণ।"

অম্বিকা। না বিরজা ওকথা বলনা, তুমিই আমার সুখ, তুমিই আমার সর্ব্বস্ব—তুমি আমার স্বপ্ন, তুমি আমার জ্ঞান।

অম্বিকা আবার রক্ষীপরিবৃত হইয়া চলিল, বিরজা নির্নিমেষ লোচনে অম্বিকার প্রতি চাহিয়া রহিল, কিন্তু অশ্রু-নীরে চক্ষু দৃষ্টিহীন হইয়া পড়িল। ক্রমে অম্বিকা প্রকৃতই দৃষ্টির বহির্ভূত হইলেন। বিরজা তখন স্বীয় হৃদয়মন্দিরে সেই দেবচিত্র অঙ্কিত করিয়া অশ্রুনীরে বক্ষস্থল বিধৌত করিতে লাগিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

—ঃঃ—

কল্পনার বিকাশ।

যথাসময়ে গোপালচন্দ্র বিজয়কৃষ্ণ ও বিরজা প্রভৃতি সকলে মুর্শিদাবাদে চলিলেন—সকলেরই মুর্শিদাবাদ যাইবার উদ্দেশ্য আছে, কিন্তু বিরজা যে কেন যাইতেছে তাহা সে জানে না, না যাইবার জন্য কত নির্ব্বন্ধতা প্রকাশ করিল, কিন্তু, গোপাল-

চন্দ্র ছাড়িলেন না, তিনি বলিলেন, "বিরজা তোমার যেরূপ মানসিক বিকৃতি জন্মিয়াছে তাহাতে দেশ ভ্রমণ ব্যতিরেকে তাহার উপশম হইবে না।" কিন্তু বিরজা মনে মনে বলিল "দেশ ভ্রমণে তাহার উপশম হইবে না- তবে পরলোকে যাইলে হইতে পারে।" যাহাই হউক বিরজা আজি মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিল। যাহার হৃদয় বিষণ্ণ, যাহার মনে সুখ নাই, তাহাকে নন্দনকাননে লইয়া যাও সে সুস্থ হইবে না, সুতরাং মুর্শিদাবাদের রমণীয়তা যে বিরজার প্রাণে কিছুমাত্র সুখ বৃদ্ধি করিতে পারিল না, অথবা সেই বিকৃতভাবাপন্ন হৃদয়ের কিছুমাত্র উপশম সাধন করিতে সক্ষম হইল না তাহা নিশ্চয়। আমরা বলি বরং তাহার বৃদ্ধি হইয়াছে। আজি বিরজা বিজয়চন্দ্রের বাটীতে রহিয়াছে, সেই পাষণ্ড, যাহার নৃশংস ব্যবহারের জন্য তাহার ইহ জীবনের সমস্ত সুখ নষ্ট হইয়াছে, যাহার স্বেচ্ছাচারিতার জন্য একটী হত-ভাগ্যের ইহজীবনের সমস্ত আশালতা শুষ্ক হইয়াছে, আজি বিরজাকে শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই পামরের মুখাবলোকন করিতে হইতেছে। সুযোগ পাইলে বিজয় বিরজার সহিত কথা কহিতে চেষ্টা করে, কিন্তু বিরজা দুঃখে রাগে ম্লান বদনে তথা হইতে চলিয়া যায়। ইহ জগতের একমাত্র সহায় গোপালচন্দ্রকে বলিলে তিনি তাহার কোন প্রতিউত্তর দেন না। বিরজার আর উপায় নাই, বিরজার ইহ জগতে অন্য সহায় নাই, দুঃখ জানাইবার স্থান নাই—কিন্তু বিরজা জানিত, শ্রেষ্ঠের শ্রেষ্ঠ, সকলের বিধাতা, অনাথ সহায় একজন আছেনই আছেন, বিরজা অবিরত সজল নয়নে দীনভাবে

তাঁহারই নিকট আপন দুঃখের কান্না কাঁদিত। কিন্তু লোকেও তাঁহার কার্য্য দেখিতে পায় না, অনুভব করে, কিন্তু আজিও হতভাগিনী বিরজার সে অনুভবের সময় উপস্থিত হয় নাই!

গ্রীষ্মকাল, দিবা দ্বিপ্রহর অতীত, বিরজা আপন শয়ন কক্ষের খট্টোপরি শয়ন করিয়া রোদন করিতেছে। বিরজা রোদন করিলে বিজলী নিশ্চিন্ত থাকিত না, নানা উপায়ে নানা কৌশলে নানা প্রকারে সান্ত্বনা করিত, কিন্তু এসময়ে বিজলী অন্য কার্য্যে ব্যস্ত, সুতরাং বিরজা আপন মনে অঝোরে কাঁদিয়া আপন মনোভাব লাঘব করিতেছে, এমত সময়ে তথায় গোপালচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বিরজাকে রোদন পরায়ণা দেখিয়া ক্ষণেক নির্নিমেষনয়নে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন, বিরজার অপরূপ রূপ মাধুরী একে একে তাঁহার নয়ন পথে আবির্ভূত হইতে লাগিল, তিনি মনে মনে বলিলেন "মা আমার রূপে লক্ষ্মী গুণে সরস্বতী—এরূপ কি পামর অধিকার পর্ণকুটীরে শোভা পায়? ইহা রাজার ঘরে শোভা পাইবে।"

বিরজা এখনও তাঁহার পিতাকে দেখে নাই, সে এখনও এক মনে কাঁদিতেছে, গোপালচন্দ্র আর থাকিতে পারিলেন না বলিলেন " বিরজা, মা কাঁদ্চ কেন?"

বিরজা চমকিয়া উঠিল, দেখিল, সম্মুখে পিতা দণ্ডায়মান, শশব্যস্তে শয্যায় উঠিয়া বসিল, সেই গোলাপী অধরে সহসা রক্তের সঞ্চার হইল, সেই অতুলরূপের ক্ষনিক পরিবর্ত্তন যে কত মধুর, তাহা বর্ণন করা দুরূহ।

বিরজা গোপালচন্দ্রকে দেখিয়া অশ্রুবেগ সম্বরণ করিতে চেষ্টা করিল বটে কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিল না, বরং অশ্রুধারা পূর্ব্বাপেক্ষা প্রবলতর বেগে প্রবাহিতহইতে লাগিল।

গোপালচন্দ্র পুনরপি বলিলেন "বিরজা কাঁদ্‌চ কেন?" বিরজা সে কথার কোন প্রতি উত্তর দিতে পারিল না, বস্তুতঃ তাহার সেই নয়ন বারি তাহার যে উত্তর দিতে ছিল তাহা নিজ্জীব ভাষায় ব্যক্ত হয় না, কিন্তু গোপাল পাষণ্ড, আপন অভিপ্রায় সিদ্ধ করিতেই পাগল, সে কেন একজন অনাথিনী অভাগিনীর নয়ন জল দেখিয়া বিকলচিত্ত হইবে?

গোপাল কহিলেন "ছি মা কেঁদনা, কান্না কেন?"

বিরজার মুখে কথা আসে আসে আসেনা, মুখ ফুটে ফুটে ফুটে না। বিরজা বলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কথা সরিল না, কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল।

তখন গোপালচন্দ্র বলিলেন "বিরজা তুমি বালিকা, আমি যে তোমার সুখ সৌভাগ্যবৃদ্ধির জন্য কত চেষ্টা করি তা তুমি কি জানিবে? যখন বয়স হইবে, জ্ঞান হইবে, ভাল মন্দ বিচার করিতে শিখিবে, তখন বলো যে আমি বিজয়ের সঙ্গে তোমার বিবাহ দিয়ে ভাল করৃছি কি না।"

বিরজা চমকিয়া উঠিল, তাহার আপদ মস্তক কাঁপিয়া উঠিল, তালু শুষ্ক হইয়া আসিল, শরীর কণ্টকিত ও হৃদ্‌কম্প উপস্থিত হইল। বিরজা কোন কথা কহিতে পারিল না।

"মৌনং সম্মতি লক্ষণং" বুঝিয়া গোপালচন্দ্র বিরজার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া কহিলেন "কাল দিন ভাল আছে, কালই বিবাহ দিব।"

কবে বিবাহ হইবে না হইবে তাহা না জানিয়া বিরজা যে উৎকণ্ঠারূপ আশ্বাসের ভ্রূকুটী ভঙ্গি সহ্য করিতে ছিল তাহা এতক্ষণে তিরোহিত হইয়া ততোধিক আতঙ্ক উপস্থিত হইল। যে দেশে বিচার নাই, প্রণয়ের পাত্রাপাত্র নাই, পরের হস্তে বল পূর্ব্বক সমর্পণ করিলেই বিবাহ হয়, সে দেশে গোপালচন্দ্র বিরজাকে বিজয়ের হস্তে সমর্পণ করিলে আর উপায় কি? বিরজা কি বলিবে? আশ্রুনীরে ভাসিতে ভাসিতে হয়ত বিজয়কে স্বামী বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, বিরজা এইরূপ নানাবিধ ভাব অমঙ্গল স্মরণ করিয়া আতঙ্কে শিহরিতে লাগিল।

বিরজার হৃদয় এখন স্তম্ভিত, যে বিরজা এতক্ষণ আকুল নয়নে রোদন করিতে ছিল, সে বিরজার চক্ষে এক্ষণ আর জল নাই, বিরজা নির্ব্বাক নিস্পন্দ, কিন্তু তাহার হৃদয়ে চিন্তা ও আতঙ্কের যে উত্তাল তরঙ্গ ক্রীড়া করিতে ছিল তাহার নিকট ঘোর ঝটিকা কালিন তরঙ্গমালা সমাকুল পারাবার বক্ষও পরাস্ত হয়।

গোপাল বিরজার রোদন ভঙ্গের কারণ তাঁহার প্রদত্ত সুসংবাদকেই নির্দ্দেশ করিয়া পরম সন্তুষ্টচিত্তে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। যে প্রবল শোকোচ্ছাস মুহূর্ত্তমাত্র স্তম্ভিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে যেন নূতন বেগে বলীয়ান হইয়া সহস্রধারে উছলিয়া উঠিল। যে রোধ প্রবল স্রোতে ভাঙ্গ ভাঙ্গ হইয়া ছিল, তাহা ভাঙ্গিয়া গেল,—বিরজা আবার অঝোরে কাঁদিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

শাস্তি।

বিরজা একাকিনী অঘোরে কাঁদিতেছে, এমত সময় তথায় বিরজার প্রিয় সখি বিজলী আসিয়া উপস্থিত হইল, বিজলী ক্ষণেক নিশ্চেষ্ট ভাবে বিরজার পার্শ্বে বসিয়া রহিল, তখন বিরজা একবার স্থির দৃষ্টে বিজলীর প্রতি তাকাইল, বিজলীকে দেখিয়া বিরজার শোক যেন শত ধারে উথলিয়া উঠিল।

বিরজা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিল "সই।"

বিজলী। কেন সই, কাঁদ্‌চ কেন?

বিরজা তখন কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত ঘটনা বিবৃত করিল।

বিজলী ক্ষণেক স্তম্ভিত ভাবে বসিয়া রহিল, পরে বিরজাকে নানা প্রকারে শান্তনা করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। বিরজা উন্মাদিনীর ন্যায় জ্ঞান শূন্যা হইয়া রোদন করিতে লাগিল। তাহার অবস্থা দেখিয়া বিজলীর বড়ই দুঃখ হইল, কিন্তু উপায় কি? এ সংসারে বিরজার কাঁদিবার—দুঃখ জানাইবার একমাত্র স্থান বিজলী—বিজলী বিরজার শান্তি, বুদ্ধি ও উপায়, আজি সেই বিজলী তাহার উদ্ধারের কোন উপায়ই স্থির করিতে পারিতেছে না।

অনেকক্ষণ ক্রন্দনের পর বিরজা বলিল "সই কি হবে?

বিজলী। উপায় ত দেখিনা।

বিরজা ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল "কি, উপায় নাই, তবে কি আমায় ঐ পিশাচের পত্নী হইতে হইবে?

বিজলী নিস্তব্ধ।

বিরজা সকরুণে আবার কহিল "সই আর কিছু না পার মৃত্যুতেও কি সহায়তা করিতে পারিবে না?"

বিজলী বিস্মিত হইয়া কহিল "তুমি মর্‌বে?

বিরজা। তাহাতে কি সন্দেহ আছে?

বিজলী কাঁদিয়া বলিল "এমন কপালও করে ছিলে? কিন্তু না সই তোমায় আমি এ কচি বয়সে মরিতে দিবনা, ইহার উপায় করিব।"

বিরজা। কি উপায়?

বিজলী। সে কথায় এখন কাজ কি, পরে জানিতে পারিবে।

এই বলিয়া বিজলী উঠিয়া দাঁড়াইল।

বিরজা। কথায় যাইবে?

বিজলী। এখন কোন কথাই নয়।

বিজলী চলিয়া গেল। বিরজা সোৎসুক চিত্তে অবাক্ হইয়া রহিল।

সন্ধ্যার সময় বিজলী ফিরিয়া আসিল। বিরজা তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না, ভয়, পাছে বিজলী কোন মন্দ সংবাদ দেয়।

বিজলী একবার তাহার সেই সুদীর্ঘ চক্ষু দুইটী দিয়া পূর্ণ দৃষ্টিতে বিরজাকে দেখিয়া বলিল "বিরজা, সই—"

বিরজা বিজলীর দিকে তাকাইল।"

বিজলী। আমি তোমায় উদ্ধার করিব।

বিরজা। পারিবে?

বিরজা। নিশ্চয়।

বিরজা। কি করিতে হইবে?

বিজলী। কিছু না, নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাও।

বিরজা কিছুই বুঝিল না, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া নিস্তব্ধ হইল।

যথা সময়ে সকলে আহারাদি করিয়া নিদ্রাগত হইলেন রজনী ক্রমশঃ প্রগাঢ় হইয়া আসিল। যখন নিদ্রা দেবীর শান্তিময়ী সুখদ অঙ্কে সকলেই সুষুপ্ত; কোথাও কোন শব্দ নাই, প্রকৃতি নিস্তব্ধ, পৃথিবী বুঝি অচেতন—যাবতীয় জীব মৃত; এমত সময় বিজলী ধীরে ধীরে বিরজার শয্যায় যাইয় তাহার অঙ্গ স্পর্শ করিল, দেখিল বিরজা জাগরিতা,—চমকিয়া বলিল "সই!"

বিজলী মৃদুস্বরে বলিল "শয্যা হইতে উঠ, আমার সহিত আইস।"

বিরজা একটী কথাও না কহিয়া তাহাই করিল। উভয়ে নিঃশব্দে সেই গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সাধারণ জনপথে উপস্থিত হইল।

তখন বিজলী বলিল "কোন কথা কহিও না, আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আইস।"

বিরজা তাহাই করিল।

নবম পরিচ্ছেদ।

ইহা কি স্বপ্ন?

উভয়ে এই রূপ নিস্তব্ধ ভাবে অনেক দূর যাইয়া বিরজা আর থাকিতে পারিল না, একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল "আমরা কোথায় যাইতেছি?"

বিজলী। যে দিকে চক্ষু যায়।

বিরজা। আমরাত চলিলাম, কিন্তু এসময়ে একবার অম্বিককে কি দেখিতে পাই না?

বিজলী। সে পরের কথা, এখন ত বিজয়কে বিবাহ করিতে এড়াও।

বিরজা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিল, বিজলী দেখিল বিরজা কাঁদিতেছে, বলিল "সই কাঁদ্চ!"

বিরজা তাহার কোন উত্তর না দিয়া, নীরবে কাঁদিতেই লাগিল।

বিজলী। সই কেঁদ না, কাঁদিলে আমি তোমার সঙ্গে যাইব না।

বিরজা অবাক্ হইল, কিন্তু কোন কথাই কহিল না।

আরও কতক দূর যাইয়া উভয়ে একটী প্রকাণ্ড মাঠে পড়িল। বিজলী বলিল "সই দেখ দেখি, চাঁদের আলোয় মাঠের কি অপূর্ব্ব শোভা হয়েছে!"

বিরজা একবার চতুর্দ্দিকে চাহিল; কিন্তু তাহার তাহা ভাল না লাগায় আর কোন কথা কহিল না।

উভয়ে ক্রমশঃ একটী বৃক্ষ সন্নিকটে উপস্থিত হইল।

বিজলী ভাতি বিহ্বল স্বরে কহিল "সই, গাছ তলায় কে দেখেছ?"

বিরজা। মানুষ।

বিজলী। কি জানি মানুষ কি ভূত।

বিরজা। এত রাত্রে এখানে মানুষ কেন?

বিজলী। বল্‌তে পারি না, আর এই ভিন্ন ত পথ নাই, কি কর্‌বে কর।

বিরজা। চল যাই।

বিজলী। আমি যাব না, তুমি আগে গিয়ে দেখে এস।

বিরজা একবার বিজলীর বদন প্রতি চাহিল, বলিল "সই তুমি ঐত নিষ্ঠুর হলে কেন?"

বিজলী। কেন তুমিত ভাই মর্‌তে স্বীকার ছিলে, এখন ঐ গাছ তলায় একাকিনী যেতে ভয় পাচ্চ কেন? আর এখন ভয় করিলেই বা চল্‌বে কেন?

বিরজা আর একটী কথাও না কহিয়া সেই দিকে ধাবিত হইল।

বিরজা বৃক্ষের নিকটবর্ত্তিনী হইলে মানবটী তাহার নিকটে আসিল. চন্দ্রকিরণের সহায্যে বিরজা তাহার আপাদ মস্তক বেশ দেখিতে পাইল। বিরজার মস্তক ঘুরিয়া উঠিল, তাহার জ্ঞান অপনোপনের উপক্রম হইয়া উঠিল। মানবটী বিরজাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন "বিরজা, বিরজা, প্রাণাধিকে বিরজা!"

বিরজা কোন কথা কহিতে পারিলেন না, তাহার নয়ন দিয়া

অঘোরে অশ্রু নিপতিত হইতে লাগিল, তখন তিনি মনে মনে ভাবিতেছিলেন "ইহা কি স্বপ্ন ?"

দশম পরিচ্ছেদ।

—•:•—

নবজীবন।

বিরজা অম্বিকার বদন প্রতি এক দৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

অম্বিকাচরণ বিরজার মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন "কি বিরজা!"

বিরজা। অম্বিক, আবার যে এ জীবনে তোমার দেখা পাইব সে আশা ছিল না, তাই তুমি বস, আমি তোমার কোলে শুই, শুয়ে শুয়ে তোমার মুখ খানি দেখি।

অম্বিকাচরণ তাহাই করিলেন।

এমত সময়ে বিজলী তথায় উপস্থিত হইল, বলিল "একি এ যুগল মিলন কিরূপে হল।"

বিরজা উঠিয়া বসিল, বিজলীকে আলিঙ্গন করিয়া কহিল 'তোমারই কৃপায়।"

বিজলী মৃদু হাসিয়া সে কথায় আর কোন উত্তর না দিয়া বলিল "রাত্রি আর অধিক নাই, আমাদের এখনি যাত্রা করা কর্ত্তব্য।"

অম্বিকা। চল—নৌকা প্রস্তুত।

বিরজা। গঙ্গা এখান হইতে কতদূর?

অম্বিকা। অতি নিকট।

সকলে ভাগিরথী দিকে চলিলেন, বিরজার মনে তখন যে কত প্রকার ভাবের উদয় হইতেছিল, তাহা বলা যায় না। তাহার হৃদয় আনন্দে ক্ষণে ক্ষণে স্ফীত হইতেছিল, আবার থাকিয়া থাকিয়া কাঁদিয়াউঠিতেছিল; মনে হইতে ছিল "অম্বিকা আমার হইবে এমন কপাল কি করিয়াছি" কখন কখন মনে মনে ঈশ্বর সমীপে কত কাকুতি, কত মিনতি, কত প্রার্থনা করিতেছিল; এমত সময়ে তাহারা গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইল, তথায় একটী নৌকা ছিল, তিন জনে নৌকায় আরোহণ করিল,—একটানায় নৌকা সবেগে ছুটিতে লাগিল।

দুই দিবস পরে সকলে কাল্‌নায় উপস্থিত হইলেন।

অম্বিকাচরণ দুই চারি দিবস কাল্‌নায় অবস্থিত করিলেন, তথায় যথা রীতি তাঁহাদের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইল। বিরজার আহ্লাদের পরিসীমা নাই—বিজলীরই বা কত আনন্দ; তাহারা যেন নূতন পৃথিবীতে আসিল।

কাল্‌নায় কোন প্রকার সুবিধা না দেখিয়া তাঁহারা তথা হইতে কৃষ্ণনগর যাত্রা করিলেন। অম্বিকাচরণ তথায় ক্রমে কৃষ্ণনগরাধিপতির সহিত পরিচিত হইলেন।

মহারাজ বিশেষ গুণগ্রাহী লোকছিলেন, অম্বিকাচরণের গুণগ্রাম দেখিয়া তিনি তাঁহাকে আপন পারিষদ রূপে নিযুক্ত করিলেন, অম্বিকা রাজ প্রসাদে সপরিবারে সুখে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। বিরজার আর সুখের পরিসীমা নাই।

বিরজাও নানা প্রকার কারুকার্য্য জানিত। মহারাণী সেই জন্য তাহাকে বিশেষ ভালবাসিতেন। ক্রমে তাঁহারা স্ত্রীপুরুষে রাজা ও রাণীর বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের তমসাচ্ছাদিত আকাশ পটে সুখ সূর্য্য সমুদিত হইল।

বিবাহের দুই বৎসর পরে বিরজার একটী সন্তান জন্মিল। মহারাজ এই উপলক্ষে অম্বিকাকে নানা প্রকার মূল্যবান দ্রব্য উপহার প্রদান করিলেন, এবং স্বয়ং সন্তানটীর নাম বিভূতি ভূষণ রাখিলেন। বিভূতি দিনে দিনে পরিবর্দ্ধিত হইয়া আপন অপরূপ রূপ লাবণ্য ও সৌন্দর্য্যে সকলের বড়ই ভালবাসার পাত্র হইয়া উঠিল।

এতদিনে অম্বিকা বিরজা ও বিজলী পূর্ব্ব দুঃখ সকল বিস্মৃত হইলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

মজার কথা।

বিরজা ও বিজলীর নিরুদ্দেশের পর দিন প্রাতঃকালে গোপালচন্দ্র দেখিলেন যে বিরজাও নাই বিজলীও নাই. নানা স্থানে অনুসন্ধান করা হইল, কিন্তু কোথাও তাহাদের অনুসন্ধান পাওয়া গেল না। গোপালচন্দ্র হতাশ হইলেন, তাঁহার আশা-লতা ছিন্ন হইল।

যথাসময়ে সংবাদ আসিল যে অম্বিকাচরণও নিরুদ্দেশ—তখন আর কাহারও প্রকৃত ঘটনা বুঝিতে বাকি রহিল না। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিবার ন্যায় গোপালচন্দ্রের ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি বিজয়চন্দ্রের সহিত তৎক্ষণাৎ মহামান্য কাজির নিকট গেলেন, কাজি বলিলেন "অনুসন্ধান না পাইলে কি করিব।" অনুসন্ধান হইতে লাগিল, কিন্তু কোন ফল দর্শিল না।

বিজয়চন্দ্র গতিক মন্দ দেখিয়া নন্দনপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, গোপালচন্দ্রও তাঁহার সহিত আসিলেন। বিজয়ের সহিত গোপালচন্দ্র যে সম্বন্ধের সূত্রপাত করিয়াছিলেন, তাহা সহসা ছিন্ন হইল।

গোলালচন্দ্রের মনে বড় ধিক্কার হইল। তিনি শপথ করিলেন যে বিরজাকে আর কন্যা বলিয়া গ্রহণ করিবেন না। সেই দিবসই তিনি পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই পুনর্ব্বার দারা পরিগ্রহ করিলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে তাঁহার সম্পত্তির এক কপর্দ্দকও বিরজা না পায়, ইহাই তাঁহার ইচ্ছা এবং সেই অভিপ্রায়েই তিনি বিবাহ করিলেন।

গোপালচন্দ্র একটী চতুর্দ্দশ বর্ষিয়া যুবতীর পাণিগ্রহণ করিলেন, তাঁহার নব বিবাহিতা পত্নী দেখিতে মন্দ নয়, মধ্যাকৃতি উজ্জল শ্যামবর্ণ, উন্নতনাসিকা, চক্ষু দুইটী যেমন বিস্তৃত তেমনি মনোহর,—ললাট কিঞ্চিৎ প্রশস্ত, বিশেষতঃ ভ্রূসংযমের ঠিক উপরিভাগটী। রমণীর নাম মেক্ষাদা সুন্দরী। মোক্ষদারি সহিত গোপালচন্দ্রের প্রণয় হওয়া অসম্ভব, বৃদ্ধে ও

যুবতীতে প্রণয় প্রায়ই হয় না, কিন্তু গোপাল তাহা মানিতেন না। তিনি তাহাকে কত সোহাগ করিতেন, কত প্রকারে ভালবাসা দেখাইতেন, ইচ্ছা যে মোক্ষদা তাঁহাতে একান্ত অনুরক্ত হউক ? কিন্তু যাচিয়া প্রেম ও ঘসিয়া রূপ কি হয় ?

* * * *

আজি প্রায় ছয় বৎসর হইল বিরজা নিরুদ্দেশ এবং গোপালচন্দ্র বিবাহিত হইয়াছেন। গোপালের পত্নীর বয়ক্রম এখন বিংশতি বৎসর, কিন্তু সন্তানাদি হয় নাই, হয়ত মোক্ষদার আর সন্তানাদি হইবেনা। যত বয়স বাড়িতেছে গোপালচন্দ্র ততই উদ্বিগ্ন হইতেছেন, সন্তান হইবার আশা ততই কমিতেছে। এই ছয় বৎসর মধ্যে গোপালচন্দ্র এক দিবস ভ্রমেও বিরজার নাম মুখে আনেন নাই, গোপালচন্দ্র মধ্যে মধ্যে কাজির নিকট হইতে অম্বিকাচরণের গেপ্তারের সংবাদ লয়েন কিন্তু কোন সময়েই সন্তোষ জনক সংবাদ প্রাপ্ত হন না।

বিজয়চন্দ্রের সহিত গোপালচন্দ্র যে সম্বন্ধের আশা করিয়া ছিলেন, অনেক দিন হইল যে আশা গিয়াছে, কিন্তু বিজয় এখনও ঘনিষ্ঠতা ছাড়ে না। বিজয় প্রায়ই গোপালের বাটীতে বেড়াইতে আসেন এবং পান খাইয়া যান, কিন্তু এ ঘনিষ্ঠতা গোপালচন্দ্রের ভাল লাগে না, অথচ বলিতেও পারেন না। বাটীতে যুবতী ভার্য্যা, গোপাল কখন থাকে কখন না থাকে, এ অবস্থায় আত্মীয়তা দেখাইতে বিজয়ের তাঁহার বাটীতে যাওয়া অন্যায়, কিন্তু বিজয় তাহা বুঝেন না। গোপালচন্দ্রের ইহাই দুঃখ !

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

—*—

নবসূত্র।

আজি প্রায় বৎসরাবধি হইল, বিজয় পূর্ব্বাপেক্ষা সমধিক দুর্ব্বল ও কৃশ হইয়াছেন। চিকিৎসকের মত যে তিনি কিছু দিবস নৌকা করিয়া জল পথে ভ্রমণ করেন। বলা বাহুল্য যে সেই রূপই করা হইল। বিজয়চন্দ্র আজ সপ্তাহাবধি জল পথে ভ্রমণ করিতেছেন।

কৃষ্ণনগরাধিপতিও ঠিক এই সময়ে নৌকারোহণে তীর্থ যাত্রায় যাইতে ছিলেন, সঙ্গে সতন্ত্র নৌকায় সপরিবারে অম্বিকা-চরণও যাইতেছিলেন। মুর্শিদাবাদ পৌঁছিবার অনেক পূর্ব্ব হইতে অম্বিকাচরণ বিশেষ সতর্ক হইলেন, তিনি পূর্ব্বের ন্যায় অ.. নৌকার বাহিরে আইসেন না, সতত ভিতরেই থাকেন। পাছে কেহ কিছু মনে করেন—সেই জন্য তিনি পূর্ব্ব হইতে সকলের নিকট আপন শারীরিক অসুস্থ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। দৈব দুর্ব্বিকাকে অম্বিকার ঘোর শত্রু নর পিশাচ বিজয়-চন্দ্র ঘটনাক্রমে সেই দিকে জল পথে ভ্রমণ করিতেছিলেন, তিনি নৌক হইতে অম্বিকাচরণকে দেখিয়া তখনই তাঁহার অনিষ্ট স.ধনে যত্ন পর হইলেন।

যও অম্বিকা চরণ জানিতেন যে নৌকা মুর্শিদাবাদের ঘাটে লা - হইবে না, তথাপি তিনি তথায় পৌঁছিবার পূর্ব্ব হইতে

স্বীর নৌকা রাজ নৌকা হইতে প্রায় দুই ক্রোশ পশ্চাতে রাখি-লেন। তিনি মনে করিলেন মহারাজা মুর্শিদাবাদে পৌছিলে হয়ত নবাব সরকার হইতে কেহ না কেহ তাঁহার সম্মান রক্ষা করিতে আসিবে, অতএব সে সময় নিকটে থাকিলে কি জানি যদ্যপি তাহারা জানিতে পারে, তাহা হইলে আবার ঘোর শঙ্কট উপস্থিত হইবে।

অম্বিকা এ পর্য্যন্ত তাঁহার পূর্ব্ব কাহিনীর বিন্দুমাত্র মহা-রাজাকে বলেন নাই, কেন বলেন নাই, তাহা আমরা বলিতে পারিনা। অম্বিকা মনে করিয়া ছিলেন কি জানি একথা শুনিলে মহারাজ যদ্যপি তাঁহাকে নাবাবের ভয়ে আশ্রয় না দেন।

নানা প্রকার ভাবিয়া চিন্তিয়া অম্বিকা আপন নৌকা মহা-রাজের নৌকা হইতে অনেক দূরে রাখিলেন, এবং স্বয়ং তন্মধ্যে গুপ্ত ভাবে রহিলেন। তিনি নিশ্চয় জানিতেন যে এরূপ গুপ্ত ভাবে যাইলে কেহই তাঁহার বিষয় জানিতে পারিবে না। বস্তুতঃ! তিনি যে রূপ সতর্ক ভাবে যাইতে ছিলেন তাহাতে যে কেহ তাঁহাকে চিনিবে, বা তিনি যে নৌকায় যাইতেছেন সে বিষয় কেহ জানিবে তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব, কিন্তু ভবিতব্যতা অখণ্ডনীয়, গ্রহবৈগুণ্য থাকিলে কাহার সাধ্য তাহাকে রক্ষা করে—তোমার সতর্কতা প্রভৃতি সকলই তাহার নিকট পরাস্ত হয়, কথা [illegible] "মাটি ফুড়ে কাটে সাপ [illegible] নরে।"

যখন [illegible] মহারাজের তরণী সমূহ মুর্শিদাবাদ অতিক্রম করিয়া [illegible]রণমাত্র অম্বিকার নৌকা যাইবে। [illegible]নূর মুর্শিদাবাদ পৌছিতে অল্প বিলম্ব আছে এমত সময়ে গতি[illegible] নিবারণ করিয়া কতিপয় নৌকা সবেগে অম্বিকাচরণের [illegible]

দিকে আসিতে লাগিল। বিজলী তখনই সে সংবাদ অম্বি-কাচরণকে দিলেন, অম্বিকা কম্পিত হৃদয়ে ত্রস্ত ভাবে নৌকার গবাক্ষ দিয়া গুপ্ত ভাবে দেখিলেন, কোন আশু অমঙ্গল সম্পাত হইবে তাহা তিনি তৎক্ষণাৎ বুঝিলেন। বিরজার সরোজ বদন শুকাইল, সেই ইন্দিবর তুল্য নয়ন যুগল সজল হইল, অম্বিকা বিরজার বদন প্রতি তাকাইলেন, তাহার মুখ ভাব দেখিয়া তাঁহার বড় ক্লেশ হইল, হৃদয় ফাটিয়া যাইতে লাগিল, মৌখিক সাহস সহকারে বলিলেন "ভয় কি বিরজা।"

বিরজার চক্ষু দিয়া জল পড়িল, বিরজা সজল চক্ষে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল, কোন উত্তর দিতে পারিল না। মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রায় বিংশতি জন সিপাহী আসিয়া তাহাদিগকে নৌকা সমেত ধরিয়া লইয়া গেল। এই আকস্মিক ঘটনা দর্শনে অভাগিনী বিরজার মূর্চ্ছা হইল, প্রিয় সহচরী বিজলীর শুশ্রূষায় মোহাপনোদন হইলে দেখিল অম্বিকা তথায় নাই, বিভূতি ভূষণ মাতার অবস্থা দেখিয়া তাঁহার বদনের নিকট স্বীয় বদন খানি র[illegible]খিয়া "মা মা" বলিয়া ডাকিতেছে ও অঝোরে কাঁদিতেছে।

ষষ্ঠ বর্ষীয় বালকের জ্ঞান আছে কি? কিন্তু বালককে দেখিলে তাহার যে সে সমস্ত বুঝিবার বেশ ক্ষমতা আছে তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়। বালকের আকুল নেত্রের জল দেখিলে পাষাণ হৃদয়ও বিদীর্ণ হয়। [illegible] কি কেবল মাতার ক্রন্দন দেখিয়া কাঁদিতেছে? না, তাহা নহে, তাহা হইলে কেবল "মা মা" বলিয়াই কাঁদিত, কিন্তু বিভূতি একবার বা "মা ওঠ, মা" বলিয়া নয়নজলে ভাসিতেছে, আবার কখন, "বাবা, বাবা [illegible]থায় গেল মা, কে আমার বাবাকে ধরে নিয়ে গেল মা, আমি

যে বাবার কোলে যাব।" আবার কখন কখন বলিতেছে "বড় মা" বিভূতি বিজলীকে বড় মা বলিত, "বড় মা আমার বাবা কোথা গেল? আমার বাবা কই বড় মা!"

বিরজা চক্ষু উন্মীলন করিয়া একবার ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া বলিল "অম্বিক, অম্বিক, অম্বিক কই! বিজল, সই আমার, অম্বিক কোথায়? বল আমার প্রাণ বাঁচাও।"

বিজলী তাহার কোন উত্তর দিল না, কেবল রোদন করিতে লাগিল। তাহার নয়ন বারিই তাহার সকল কথা প্রকাশ করিতে লাগিল।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

বিচার।

বিজয়চন্দ্র মুর্শিদাবাদ পৌঁছিবার পূর্ব্বে অম্বিকাচরণকে গ্রেপ্তার করিবার আদেশ বা উপদেশ যে কৌশল ক্রমে পূর্ব্ব হইতে পাঠাইয়া ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এ দিকে মহা রাজ বাহাদুর যথা সময়ে অম্বিকাচরণকে দেখিতে না পাইয়া মনে করিলেন অম্বিকাচরণের তীর্থ যাত্রায় বাসনা ছিলনা, তাহাই আসেন নাই, কেননা আসিবার পূর্ব্বেও তিনি একবার ঐ রূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাহাই হউক যদি এইরূপ পলাইবার ইচ্ছাই ছিল, তবে আসিবার কি প্রয়োজন?

বলা বাহুল্য যে মহারাজ অম্বিকাচরণের উপর নিতান্ত বিরক্ত হইলেন। মহারাণী বিরক্ত না হইয়া দুঃখিত হইলেন। বিরজাকে না দেখিয়া তিনি থাকিতে পারিতেন না, আজি সেই বিরজা তাঁহার সঙ্গে নাই, যে বিরজাকে তিনি আপন কন্যার ন্যায় স্নেহ করেন ভালবাসেন,সেই বিরজা আসিলনা, ইহা বাস্তবিকই দুঃখের বিষয়। তাহাও না হয় হইল, মহারাণী বিভূতি ভূষণকে ছাড়িয়া কি করিয়া থাকিবেন, বিভূতিকে তিনি প্রাণ তুল্য ভাল বাসিতেন। সে বিভূতিকে না দেখিয়া থাকিতে যে তাঁহার মর্ম্মান্তিক কষ্ট হইবে, তাহা বলা বাহুল্য।—যখনই সেই বালকের সুন্দর প্রফুল্ল প্রবিত্রতাময় বদন খানি তাহার মনে পড়িত, তখনই তাঁহার চক্ষে জল আসিত, তিনি তাহা নিবৃত্ত করিতে অনেক চেষ্টা করিলেও তাহা স্খলিত হইতে থাকিত।

* * *

এদিকে রক্ষীগণ নৌকায় উঠিয়াই অম্বিকাচরণকে উত্তম রূপে বাঁধিয়া লইয়া গেল। যাহার ইচ্ছা হইল, তিনি দুই চারি ঘা উত্তম ম[illegible] দিতেও ক্রটী করিলেন না। এ সময়ে হত ভাগিনী বিরজা মূর্চ্ছিতা, বিজলী বালক বিভূতীকে লইয়া শশব্যস্ত, সিপাহীগণ বিশেষ সুবিধা পাইয়া যে যাহা পাইল আত্মসাৎ করিল। বিরজা সর্ব্বস্বান্ত হইলেন।

অম্বিকা যাইবার [illegible] [illegible] দিগের নিকট অনেক কাকুতি মি[illegible]তি করিলেন, বলিলেন যে "তোমারা একটু অপেক্ষা [illegible]র, বিরজার [illegible]ন হইলেই যাইব।" কিন্তু তাহারা সে[illegible]। শুনিলনা, অম্বিকার চক্ষে জল আসিল, তিনি আবার বি[illegible] [illegible]হকারে বলিলেন যে "তবে একবার আমার বিভূতিকে

কোলে করিতে দাও, আমি বিদায় কালে তাহাকে একবার জন্মের মত কোলে করি, একবার তাহার মুখ চুম্বন করি” কিন্তু পাষণ্ডরা তাহাও শুনিল না, তাহাকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া গেল, বিজলীর প্রাণ কাটিয়া গেল, চক্ষু দিয়া সবেগে জল আসিল, বিমূর্চ্ছিতর মুখ চুম্বন করিয়া মনে মনে বলিল “বিরজা তুমি, ভাগ্যবতী, তোমায় এ ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিতে হইবে না বলিয়াই কি মোহ হইল।”

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

নিদারুণ ঘটনা।

বিরজার মোহ ভঙ্গ হইলে বিজলী এ সকল কথা আর তাহাকে বলিল না, কেবল মাত্র বলিল যে অম্বিকাকে [illegible] লইয়া গিয়াছে। অম্বিকাকে ধরিয়া লইয়া যাইবার কিছুক্ষণ পরে এক জন সিপাহী আসিয়া বলিল “অম্বিকা এখন বন্দী, হয়ত যাবজ্জীবন তাহাকে বন্দীভাবে থাকিতে হইবে, সুতরাং তোমরা ইচ্ছামত যেখানে [illegible] পার। সে রাজ আজ্ঞা অবহেলা করিয়া পলাইয়াছিল, তজ্জন্য তাহার [illegible] কাজি সাহেবের নিকট বিচার হইবে।”

সিপাহী এই নিদারুণ সংবাদ দিয়া চলিয়া গেলে, বিরজা ও বিজলী উভয়ে মিলিয়া অনেকক্ষণ উচ্চরবে কাঁদিতে [illegible]

বিরজা অগত্যা নৌকা ছাড়িয়া একটী বাসা ভাড়া করি-লেন। অম্বিকার অপরাধের কি বিচার হয়, তাহা জানিবার জন্য প্রাণ ওষ্ঠাগত। অম্বিকাকে যে আর দেখিতে পাইবে, সে আশা ত নাই। তবে যদি বিচারপতি সদয় হইয়া এই সামান্য অপরাধের জন্য তাহার প্রাণ দণ্ড না করেন, তাহা হইলেই মঙ্গল। কাজির অসাধ্য বিচার নাই, অসাধ্য কাজও নাই।

বিরজা নিদ্রাহার পরিত্যাগ করিয়াছে, একমাত্র বিভূতি-ভূষণ এখন তাহার শান্তি ও সন্তোষের স্থান, যখনই মন অত্যন্ত খারাপ হয়, অম্বিকার সেই বদন মাধুরী, সেই অকৃত্রিম প্রেম হৃদয় পটে উদিত হয়, তখনই বিভূতিকে কোলে করিয়া আকুল নয়নে কাঁদে ও তাহার বদন প্রতি শূন্য নয়নে চাহিয়া থাকে।

এক দিন বালক বলিল "মা কাঁদ কেন ?"

বিরজা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন "বাবা কেন কাঁদি তা যে তুমি জাননা।"

বিভূতি। আর কেঁদনা।

[illegible]রজা বালকের বিশুষ্ক বদন দেখিয়া ক্ষণেক রোদন সম্বর[illegible] করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিয়া উঠিলেন না। চক্ষু মানিল না। বালক উপায় না দেখিয়া মাতৃ গলদেশ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল। মাতা পুত্রে রোদন পরবশ হইলেন।

বালক বিভূতি আ[illegible] [illegible] [illegible]মধ্যে "বাবা বাবা" করিয়া কাঁদিয়া বির[illegible] ও বিজলীকে নেত্রাসারে ভাসাইয়া দেয়। তাহার অম্বিকা[illegible] একবার স্মর[illegible] হইলে আর রক্ষা নাই—বালক আর্ত্ত-স্ব[illegible] [illegible]বল পিতাকে দেখিবার জন্য কাঁদে। মাতাকে, মাতৃ-স্থা[illegible] বিজলীকে, তাহার পিতাকে দেখাইতে বলে। সে

সময়ে কেহই তাহাকে সান্ত্বনা করিতে সক্ষম হয় না। বালক কাহারও সান্ত্বনা মানে না, কাহারও কথায় ভুলে না। আহা, কখন আপনি মাতাকে, তাহার বড় মাকে, সান্ত্বনা করিতেছে, আবার কখন তাহারা উভয়ে সেই দুগ্ধপোষ্য বালককে সান্ত্বনা করিতে পারিতেছে না! বিভূতি পিতার জন্য কাঁদিলে তাহাকে সান্ত্বনা করা দায়, ক্রন্দন থামিলেও কত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, কতবার ফুঁপাইয়া উঠে। পাছে বিভূতি কাঁদে সেই জন্য বিজলী অনেক কষ্টে আপন যাতনা দমন করে, অনেক কষ্টে চক্ষের জল সম্বরণ করে। কিন্তু বিরজা চেষ্টা করিয়াও তাহা পারে না, তাহার চক্ষু মানে না।

নিরপরাধীর এই সামান্য বিচার হইতে দুই মাস কাটিয়া গেল, শেষ হুকুম হইল যে অম্বিকাচরণকে যাবজ্জীবন বন্দীভাবে জীবন কাটাইতে হইবে। সমস্ত দিন রাজ সরকারে কার্য্য করিবে, মাসে ৩৲টাকা মাত্র পারিশ্রমিক পাইবে। মুর্শিদাবাদ ছাড়িতে পারিবে না, পক্ষান্তে এক দিন মাত্র অবকাশ। তাহাও তিন ঘণ্টার জন্য!

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

—•✱•—

মেঘেতে বিজলী।

অম্বিকাচরণকে স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হইল। একমাস অস্থিভেদি পরিশ্রম করিয়া ৩৲ টাকা মাত্র বেতন। আর ৩৲ টাকায় একটী লোকের কি ভরণ পোষণ হয়? তবে তৎকালে সকল দ্রব্য সুলভ ছিল, তাই একরূপে কায়ক্লেশে দিনাতিপাত হইত।

কিন্তু অম্বিকাচরণ একা নহেন, এখন তাঁহার স্ত্রী পুত্র ও আর একটী ভরণীয়া আছেন, ইহাদের দশায় কি হইবে? ইহাদের ভরণ পোষণের চিন্তা করা না করা সমান, কেন না তাঁহার আর উপায়ান্তর নাই—তাঁহার ইহজীবন এইরূপ বিষাদেই কাটাইতে হইবে। দুর্দ্দণ্ড জমিদারের কোপে পড়িয়া একটী নিরীহ নিরপরাধীর ইহ জীবন কি ভয়াবহ হইল তাহা দেখ।

বিরজার চলে কি প্রকারে, বালক বিভূতি খায় কি? ঈশ্বর তোমার মহিমা অপার, তুমি যে কি অপূর্ব্ব কৌশলে এই বিশ্ব-সংসার পরিচালিত করিতেছ, তাহা বুঝিয়া উঠে এমন লোক সংসারে নাই—কিন্তু আমরা তোমার কার্য্যের কূটতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কেবল বৃথা আর্ত্তনাদ করি। কোন প্রকার শিক্ষা বিষয়ে তাচ্ছিল্য করিতে নাই, কোন বিষয়ের দ্বারা যে কোন সময়ে কি উপকার দর্শিবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। বিরজা বাল্যকালে পিতৃভবনে তাহার মাতার নিকট মকমলের

উপর জরির কাজ করিতে শিক্ষা করে। বিরজা সুন্দর কারু-কার্য্য বড় ভাল বাসিত, সুতরাং তাহা অতি যত্ন পূর্ব্বক শিক্ষা করিয়াছিল, এবং ক্রমশ পরিচালনা দ্বারা তাহার সমধিক উৎকর্ষ লাভ হয়, আজি সেই শিক্ষাই বিরজার ভরণ পোষণের উপায় হইল। মুসলমানেরা জরির কাজ কিছু পছন্দ করে, তৎকালে মুর্শিদাবাদে অনেক ধনী মুসলমানের বাস ছিল, সুতরাং সে সময়ে জরির কাজের বিশেষ আদর ও কাট্‌তি ছিল।

বিরজা মকমলে নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর সূচারু কার্য্য করিয়া দিত, আর বিজলী তাহা একজন মহাজনকে নগদ মূল্যে বেচিয়া আসিত। একশত টাকার দ্রব্য মহাজন পঞ্চাশ টাকায় কিনিত, তথাপি বিরজার তাহাতে বেশ লাভ থাকিত। মকমল ও জরি কিনিবার টাকায় বিরজা প্রাণান্তেও হস্তক্ষেপ করিত না। এইরূপে তাহাদের সংসার চলিতে লাগিল। কোন আর্থিক বিশেষ কষ্ট নাই—কিন্তু মানসিক বড় কষ্ট, যে বিরজা অম্বিকাকে একদণ্ড না দেখিয়া থাকিতে পারিত না, আজি সেই বিরজা অম্বিকাকে পক্ষান্তে একবার মাত্র দেখিতে পায় এ কষ্ট, এ যাতনা কি অবলার কোমল প্রাণে সহ্য হয়? কিন্তু বিরজার ভালবাসা অনন্ত অক্ষয়, তাহার আদি নাই—অন্ত নাই, অম্বিকার ইহাই সেই তাপ দগ্ধ হৃদয়ের একমাত্র শান্তি। বিরজা! তোমার ন্যায় যাহার পত্নী তাহার কি কোন দুঃখ আছে?

ষোড়ষ পরিচ্ছেদ।

—০*০—

মন্দের ভাল।

আজি অম্বিকার আসিবার দিন, অভাগিনী বিরজা কত সাধে কত আহ্লাদে কত প্রকার খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছে, তাহার প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন অম্বিকাকে খাওয়াইবে। তাহার হৃদয় অদ্য আহ্লাদে স্ফীত হইতেছে, একটী পক্ষ অতীত হইয়াছে, সেই প্রেমপূর্ণ স্নেহময় বদন কমল অবলোকন করিতে পায় নাই, আজি তাহা দেখিয়া হৃদয় প্রাণ পরিতৃপ্ত করিবে। বিভূতি ভূষণ "বাবা আসবে বাবা আসবে" বলিয়া আহ্লাদে নৃত্য করিয়া বিজলীর মুখ ধরিয়া কত কথা বলিতে চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু আনন্দে কথা বাহির হইতেছে না। বিজলী তাহার সকল কথা বুঝিতে পারিতেছে না দেখিয়া বিরক্ত হইয়া মাতার নিকট আসিয়া তাহার বদন ধরিয়া আবার কত কথা কহিতেছে, বিজলীকে কত ভৎর্সনা করিতেছে।

সন্ধ্যা হইতে আর বিলম্ব নাই, পশ্চিমাকাশ রঞ্জিত করিয়া দিনমণি অস্তাচল চূড়াবলম্বন করিতেছেন, পূর্ব্বদিকে ম্লান বদনে নিশানাথ সমুদিত হইতেছেন, মন্দ সমীরণ মৃদুমন্দ বহিয়া যেন প্রকৃতিকে সন্ধ্যা সমাগম সংবাদ পরিজ্ঞাত করিতেছে, কলিকা সকল যেন এই সংবাদে চক্ষু উন্মিলন করিয়া একবার নিশাপতি একবার বা দিননাথের দিকে অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করিতে। মৃদু সূর্য্যরশ্মি আসিয়া যেন তাহাদিগকে বিদায়

কালিন চুম্বন করিতেছে। কুসুমচয় উৎসাহে, সোহাগে, আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িতেছে—কুমুদিনী নায়ক ইহা দেখিয়াই কি তুমি এত ম্লান ?

সমস্ত দিবসের দারুণ পরিশ্রমের পর বিরজার সাধের ধন, দরিদ্রের অমূল্য বিভব, সতীর সর্ব্বস্ব, অম্বিকাচরণ আসিলেন. বিভূতি ভূষণ "বাবা বাবা" বলিয়া নাচিতে নাচিতে পিতৃসন্নিধানে গমন করিল। অম্বিকাচরণ স্নেহভরে পুত্রমুখ চুম্বন করিলেন, সে চুম্বনে যে কি সুখ তাহা যাহার সন্তান আছে তিনিই জানেন। অনেকক্ষণ পুত্রের নানাবিধ প্রশ্নের ইচ্ছামত উত্তর প্রতি উত্তর দিয়া বলিলেন "বিরজা ভাল আছ ?"

বিরজা। হাঁ ভাল আছি—তোমার শরীর ভাল !

অম্বিকা। বড় ভাল নয় বিরজা, কএক দিন অবধি সন্ধ্যার সময় যেন একটু অসুখ করে।

বিরজা একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল, মনে হইল "হায় আমি এমনি মন্দ ভাগিনী যে স্বামী সেবা করিতে পাইলাম না, যে স্বামিসেবা সতীর সর্ব্বস্ব, সতীর অক্ষয় স্বর্গ, তাহা আমার ভাগ্যে ঘটিল না।" বিরজার সেই ইন্দিবর তুল্য নয়ন যুগল সলিল পূর্ণ হইল। অম্বিকাচরণ স্নেহ ভরে বিরজার মুখ চুম্বন করিয়া প্রাণ ভরিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, অম্বিকা যে তাহাতে কত অনুপম [illegible] করিলেন তাহা বলা যায় না। হৃদয়ে কি যেন শূন্য ছিল তাহা পূর্ণ হইল। প্রেমের অঙ্কুর যেন শুষ্ক হইয়াছিল, তাহা সরস হইল !

অম্বিকা বিরজার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া বিরজার সেই কোমল সুন্দর কর ধারণ করিয়া বলিলেন "দেখ বি[illegible] এক

পক্ষের এক একটী দিন যেন আমার এক একটী দীর্ঘ বৎসর বলিয়া বোধ হয়, আমি যে কষ্টে যে যাতনায় সে সময় অতিবাহিত করি তাহা ঈশ্বর জানেন, বিরজা! এ যাতনা যে আর সহ্য হয় না, ভাই আর কতকাল এ যম যাতনা ভোগ করিব? আমি জানি যে যতকাল বাঁচিব তত কাল ভোগ করিতে বাধ্য—ভাই, তবে আমার বাঁচিয়া সুখ কি? আহা যখন বিভুর চাঁদ মুখ খানি মনে পড়ে, তখন চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যায়, ঈশ্বরকে বলি "হে ঈশ্বর আমার কপালে কি এত দুঃখ লিখিতে হয়, কিন্তু কই আমার কাতরোক্তি ত তাঁহার চরণ কমল স্পর্শ করিতে পারে না। আমার এ অপার দুঃখ ত ঘুচেনা।"

অম্বিকার চক্ষু বহিয়া দর দর ধারে অশ্রু সম্পাত হইতে লাগিল। বিরজা আপন মনে কাঁদিতে লাগিল, কোন কথা বলিল না, কিন্তু তাহার হৃদয়ে যে কি ভীষণ শোকোচ্ছ্বাস হইতেছিল, তাহা পাষাণ হৃদয় মানব কি বুঝিবে? যিনি অন্তর্য্যামী তিনি ব্যতীত আর কাহারও তাহা অনুভব করিবারও ক্ষমতা নাই।

অম্বিকা আবার বলিলেন "আমি সপ্তাহে একবার করিয়াও যাহাতে তোমাদিগকে দেখিতে পাই সেই জন্য কাজির নিকট আবেদন করিয়া ছিলাম, কিন্তু তাহা না মঞ্জুর হইয়াছে—তবে পূর্ব্বে তিনঘণ্টা ব্যতীত থাকিতে পাইতাম না, এখন সমস্ত রাত্রি থাকিতে পাইব।"

বিরজার প্রাণ পুলকিত হইল, অপেক্ষাকৃত অধিক সময় অম্বিকাকে দেখিতে পাইবে ইহাই তাহার আনন্দ।

অম্বিকা বিভূতি ভূষণের সহিত নানাপ্রকার ক্রীড়া ও গল্প করিতে লাগিলেন। এরূপ পরাধীন জীবনে প্রাণাধিক প্রিয় কুমারের সহিত ক্ষণেক কথাবার্ত্তা কহিয়া যে কত সুখ তাহা অম্বিকা উপভোগ করিলেন। পতিরতা বিরজা তাঁহার আহারের আয়োজন করিতে গেলেন। আর এক কার্য্য—একটী সুখের কথা বিজলীকে বলিতে—অম্বিকা রাত্রি যাপন করিবে, প্রাতে আবার সে বিধুবদন দেখিতে পাইবে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

অত্যাচার।

এই রূপে দুঃখের জীবনে, দিনের পর দিন মাসের পর মাস কাটিতে লাগিল। এখন বিভূতির বয়ঃক্রম আট বৎসর, বিভূতি পাঠশালায় যায়, পাঠশালায় বালকেরা তাহার পিতার কথা উল্লেখ করিয়া হাস্য পরিহাস করে, বালক ছল ছল নেত্রে গৃহে আসিয়া মাতাকে বলে ও ক্রন্দন করে। এখন বালকের একটু জ্ঞান হইয়াছে, অজ্ঞান অবস্থায় তাহার যে জীবনটী সুখের ছিল, তাহা ক্রমশঃ দুঃখের হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যাহাতে নন্দনের পূতঃ সৌরভ বিকীর্ণ ছিল, তাহাতে সংসার নরকের পূতি গন্ধ উদ্‌গম হইবার সূত্রপাত হইয়াছে

অদ্য বিভূতি পাঠশালায় গিয়াছে, বিরজার প্রিয়সখী সত্যেন্দ্রা স্থানীয়া বিজলী মহাজনের নিকট একটী মখমলের উপর ক[illegible]রর

কাজ করা টুপী বিক্রয় করিতে গিয়াছে, বিরজা গৃহকার্য্য সমাপনান্তে নির্জ্জনে বসিয়া আপন সুচী কর্ম্ম করিতেছেন, এমত সময়ে কে দ্বারদেশে মৃদু আঘাত করিল, বিরজা বিজলী আসিয়াছে ভাবিয়া শশব্যস্তে দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিল, কিন্তু দেখিল—বিজলী নয়—অপর ব্যক্তি।

বিরজার আপাদ মস্তক কাঁপিয়া উঠিল; বাটীতে কেহ নাই, কিন্তু গৃহ মধ্যে নররূপী রাক্ষস উপস্থিত। আগন্তুক সবেগে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, বিরজার যেন সহসা বাক্‌শক্তি বিলোপ হইল।

আগন্তুক বিজয়!

বিজয় বলিলেন "বিরজা, আমি রাক্ষস নহি, আমাকে ভয় কি? আমি এক কালে তোমার প্রতিবাসী ছিলাম, তোমায় প্রাণে প্রাণে অস্থিতে অস্থিতে ভাল বাসিতাম, ভাল বাসিতাম নয় বিরজা, এখনও সেইরূপ কি তদপেক্ষা অধিক ভাল বাসি— কিন্তু তুমি আমাকে দেখিলে অমন ভীত হও কেন?"

বিরজা নিরুত্তর।

বিজয়। বিরজা আইস।

বিজয় বিরজার হস্ত ধারণ করিলেন।

বিরজা সবেগে হস্তোন্মোচন করিয়া বলিলেন "আপনি আমার গৃহে কেন-আসিলেন?"

বিজয়। কেন, বিরক্ত হইলে?

বিরজা। আমার এত অনিষ্ট করিয়াও কি আপনার আশা মিটে নাই, রাক্ষসী ক্ষুধার পরিতৃপ্তি হয় নাই?

বিজয়। আমার সকল দোষ ক্ষমা কর।

বিরজা দেখিল বিজয় মাদক সেবন করিয়াছে, আরও ভীত হইয়া বলিল "আপনি যান, আপনার এখানে আসা অতি অন্যায়।

বিজয়। কি করিব বিরজা মন যে বুঝেনা।

বিরজার সর্ব্বাঙ্গে যেন তাড়িত প্রবাহ হইল, অস্থিতে অস্থিতে শিরায় শিরায় যেন অগ্নি স্রোত প্রবাহিত হইল, হৃদয় অনন্ত শোকে উচ্ছ্বাসিত হইল, মনে মনে বলিল "হে ভগবান আমায় এমনি করিলে যে এ পৃথিবীতে আমার সহায় কেহই নাই।—এত কষ্টে, সংসারের সকল সুখাধার স্বামীর দর্শন লাভ হইতে বঞ্চিত প্রায় হইয়া অতি ক্লেশে দিনাতিপাত করিতেছি, দীননাথ, তাহাতেও কি বাদ সাধিতে হয়, প্রভো! এ অধিনীকে কি আরও ক্লেশ দিতে তোমার ইচ্ছা আছে?"

বিজয়। বিরজা কথা কও।

বিরজা দেখিল ভয় করায় কোন ফল নাই বরং অনিষ্ট আছে, সুতরাং, হৃদয়ে দ্বিগুণ সাহস করিয়া বলিল "আপনি এখনি যান।"

বিজয়। ও চাঁদ মুখ দেখিয়া কি যাইতে পারি—বিরজা সে ভিখারীটাকে বিস্মৃত হও একবার সখের প্রাণ কর।

বিরজার হৃদয় যেন জলিয়া উঠিল, সক্রোধে বলিলেন "সাবধান হইয়া কথা কহিবেন, আপনি এখনি এখান হইতে যান, নতুবা আমি চীৎকার করিব।"

বিজয়। বিরজা আমায় একবার আলিঙ্গন দাও নতুবা আমি যাইব না। আমার বাসনার পরিতৃপ্তি সাধনার জন্য যদি আমায়—প্রাণ ত্যাগ করিতে হয়, আমি অম্লান বদনে তাহাও করিতে প্রস্তুত আছি।

বিরজা সজল চক্ষে বলিল "অনাথিনী দরিদ্রার উপর এত অত্যাচার করিবেন না, ঈশ্বর কখনই এত সহিবেন না।"

বিজয় উচ্চহাস্য সহকারে কহিল "বিরজা, ঈশ্বর আবার কে?"

বিরজা। পরে জানিতে পারিবেন, তাঁহার চক্ষে ধুলা দেওয়া যায় না, তাঁহার বিচারে পক্ষপাত নাই।

বিজয়। ও সকল বাজে কথা যাক, এখন আমার প্রস্তাবে সম্মত হও, তোমার দারিদ্র্য ঘুচাও, আমি এখনি তোমাকে রাজ-রাণী করিতে পারি।

বিরজা সক্রোধে কহিলেন "সয়তান, তুমি আমায় অর্থ-লোভ দেখাইতেছ, এখনি দূর হও।"

বিজয় 'হইতেছি" বলিয়া বিরজাকে আক্রমণ করিল। বিরজা কত চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই তাহার দৃঢ় বন্ধন হইতে বিচ্যুত হইতে পারিল না, উভয়ে অনেক ক্ষণ পরস্পরে বল প্রকাশ করিল, কিন্তু ক্রমশঃ বিরজার বল হ্রাস হইতে লাগিল। বিরজার গৃহে কেহ নাই—বাটী পল্লী পার্শ্বে, সেখানে অধিক লোকের বসতী নাই, চীৎকার করিলেও কেহ শুনিতে পায় কি না সন্দেহ, বিজয় উন্মত্ত, বিরজা নিরুপায়, তাহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, বক্ষ সবেগে দুর্ দুর্ করিতে লাগিল, চক্ষে পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল, বক্ষ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। মনে মনে বলিল "দয়াময়! ঈশ্বর, অধিনীর তোমা বই আর সহায় নাই, বিপদভঞ্জন এ বিপদের সময় উদ্ধার কর দেব।"

বিজয় আবার সবেগে বিরজাকে টানিল, বিরজা ভূমিতে

পড়িয়া গেলেন, তিনি প্রাণ ভরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন, পামর তাহার বদন চাপিয়া ধরিয়া বলপ্রকাশ করিতে লাগিল। আর বিলম্ব নাই, বুঝি বা সতীর সর্ব্বনাশ হয়, বিরজা সবেগে সবলে বিজয়কে পদাঘাত করিতেছে, কত কাকুতি মিনতি করিতেছে, সতীত্ব নাশ ভয়ে উভয় চক্ষু দিয়া শত ধারে অশ্রু বিগলিত হইতেছে, তথাপি তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই, সে আপন চেষ্টায় রত। এমত সময়ে সহসা দ্রুত বেগে সেই গৃহ মধ্যে কে প্রবেশ করিল, বিরজার হৃদয় আনন্দে স্ফীত হইল, তিনি তখনি মূর্চ্ছিতা হইলেন।

আগন্তুক বিজয়কে টানিয়া আনিয়া প্রহার করিতে লাগিল, বিজয় তাঁহার নিকট ক্ষীণ প্রাণী, সুতরাং সে দারুণ প্রহারে মৃত প্রায় হইয়া উঠিল। তাহাকে, নিদারুণ প্রহার করিয়া ছাড়িয়া দিবা মাত্র সে সাধ্য মত দ্রুত পদে তথা হইতে প্রস্থান করিল।

তখনও বিরজার মোহ ভঙ্গ হয় নাই, আগন্তুক বিরজার চখে মুখে জল দিলেন, থাকিয়া থাকিয়া সেই বদন কমল চুম্বন করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে বিরজার জ্ঞান হইল, বিরজা চক্ষু উন্মীলন করিয়া সভয়ে ডাকিল "নাথ, অম্বিক!"

অম্বিকা। কেন বিরজা।

অম্বিকা আবার বিরজার মুখ চুম্বন করিলেন। বিরজা দেখিলেন, অম্বিকার চক্ষু রক্তবর্ণ, বদন মণ্ডল রক্তাভ, বুঝিলেন যে ভয়ানক রাগ বশতই এরূপ হইয়াছে। বিরজা স্বামীর উরসে আপন মস্তকটী রক্ষিত করিয়া তাঁহার বদন প্রতি চাহিয়া রহিল। বিরজা যেন স্বর্গ সুখ উপভোগ করিল, তাহার হৃদয় আনন্দে

উছলিত হইতে লাগিল। বিরজা ভাবিল এত সুখ আর কোথাও নাই, ইহাই সংসারের অনন্ত সুখ!

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

বাজে কথা।

বিরজার একটী দিন গেল, কিন্তু হতভাগ্য অম্বিকাচরণের বুঝি সকল দিন গেল। বিজয়ের অম্বিকাচরণের উপর ঘোরতর আতক্রোধ জন্মিল, যে ক্রোধ ছিল তাহা দ্বিগুণিত হইল। নানা উপায়ে তাহাকে রাজদ্বারে দণ্ডিত করিতে লাগিল। কখন বেত্রাঘাত, কখন অল্প দিন কারাবাস, এই রূপ শাস্তি অম্বিকার নিত্য নৈমিত্তিকের মধ্যে হইয়া উঠিল। অম্বিকা দেখিলেন তিনি নিরুপায়, এ সংসার—এরাজ্য আর তাঁহার সুখের স্থান নয়, এ পাপ পৃথিবী পরিত্যাগ ভিন্ন আর তাঁহার শান্তি নাই। এরূপ অত্যাচারে ওয়াসিংটন, ওয়েলিংটন, বোনাপার্টি প্রভৃতি বীরগণের হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়, তায় অম্বিকা কোন্ ছার্!

অম্বিকার দিনে দিনে সংসারে বৈরাগ্য জন্মাইতে লাগিল। তিনি যেন ক্রমশঃ আত্মবিস্মৃত হইতে লাগিলেন। বিভূতির সেই প্রেমপূর্ণ বদন তাঁহার হৃদয় হইতে ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইতে লাগিল। বিরজার ভালবাসা, সেই অপরিসীম অপরিমেয় স্বর্গীয় ভালবাসা, আর তাঁহার বিদগ্ধ হৃদয়ে প্রীতি বিধানে সক্ষম হইল না!

যে অম্বিকা বিরজার বদন নিরীক্ষণ করিতে উন্মত্ত হইতেন,

যাহাকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিয়া অবনীতে স্বর্গসুখ অনুভব করিতেন, আজি সেই অম্বিকা আর সে মুখ না দেখিয়া ব্যথিত হন না। দেখি ভাল, না দেখি ক্ষতি নাই, এইরূপ ভাব দাঁড়াইয়াছে; বিরজার যে সুখটুকু এ সংসারের আশ্রয়তরু স্বরূপ ছিল, তাহাও বুঝি নির্ম্মূল হইল।

সহস্রগুণে নারী হৃদয় পুরুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, নারী হইলে অম্বিকার এরূপ ভাবান্তর হইত কি না বলিতে পারি না। বিরজা যে সর্ব্বত্যাগিনী হইয়া তাহাকে বিবাহ করিয়াছে, সংসারের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া তাহাকে ভাল বাসিয়াছে, সংসারের মোহকর চাটুবাক্যে ভ্রূক্ষেপ করে নাই, আজি তাহারই পুরস্কার দিতে বুঝি অম্বিকার এই ভাবান্তর উপস্থিত! কিন্তু বিরজার প্রেম পূর্ব্ববৎ, তাহা অটুট, অক্ষুণ্ণ। সে অম্বিকা কিসে সংসার চলিবে, কিসে বিভূতি মানুষ হইবে, লেখা পড়া শিখিবে, এইরূপ কত প্রকার চিন্তা করিতেন, আজি আবার সেই অম্বিকা বিভূতি আহার পাইল কি না তাহা ভাবেন না, যদি এক দিন তাহারা মাতা পুত্রে আহার না পায় তাহা হইলেও হয়ত বিরস চিত্ত বা দুঃখিত হন না। মনুষ্য তোমায় বুঝা ভার! বিশেষতঃ পুরুষ তোমার হৃদয়ের বিকৃতি জন্মিলে তুমি না করিতে পার এমন কাজ নাই! কিন্তু কেন এরূপ ভাবান্তর হয় তাহা কি কেহ বলিতে পারেন?

বিরজা বা বিজলীর কথা ছাড়িয়া দি, বালক বিভূতিভূষণও তাহার পিতার এই আকস্মিক ভাবান্তরের বিষয় বুঝিয়াছে, সেও মাতার নিকট কাঁদে—বলে "মা, বাবা আর আমায় ভাল বাসে না, আমার চুমো খায় না।"

বিরজা নানা কথায় তাহাকে ভুলায়, তাহার ভয় পাছে বালক নিরুদ্যম হয়, পাছে তাহার কোমল হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়!

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

দুর্গোৎসব।

বঙ্গে দুর্গোৎসব, আজি মহামায়ার পূজা উপলক্ষে অম্বিকা চারি দিবস অবকাশ পাইয়াছেন, গত বারে বলিয়া গিয়াছিলেন যে, এই চারি দিবস বাটীতে থাকিবে, ষষ্ঠীর দিন আসিবেন।

বিরজার আনন্দের সীমা নাই—চারি দিন স্বামীকে দেখিবে, হৃদয় ভরিয়া দেখিবে, সে আনন্দ কি রাখিবার স্থান আছে? সহর লোকে লোকারণ্য, সকল লোকই যেন আনন্দে উৎসাহিত, সকলেই প্রফুল্ল। মহামায়ার সমাগমে ব্যস্ত, এই সময়ে বাঙ্গালীর হৃদয়ে কিরূপ আনন্দ হয়, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই।

সন্ধ্যা হইল, বিরজা ঘরবার করিতেছে, অম্বিকা এই আসেন। বিভূতি মাতৃদত্ত পোসাকটী পরিয়া পিতৃ আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। পিতা এখনি আসেন, বালক তাঁহাকে আপন পোষাক দেখাইবে, জুতা দেখাইবে, তাঁহার সহিত পর দিবস কোথায় পূজা দেখিতে যাইবে তাহার পরামর্শ করিবে। এইরূপ কতই ভাবিতেছে।

ক্রমে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল, অধিবাসের বাদ্যরোল হইল, অধিবাস শেষ হইল, কিন্তু অম্বিকা আসিলেন না। বিরজা উৎকর্ণ হইয়া আছে, একটী সামান্য শব্দ হইলে—মনে করিতেছে

ঐবুঝি অম্বিকা আসিতেছেন, দুই তিন বার শশব্যস্তে উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কেহই আসিল না।

বিজলী বলিল "আজ শেষ দিন, তাতে অধিক আজকর্ম্ম আছে, তাই এখনও আসিতেছেন না, রাত্রে আসিবেন।" বিরজাও তাহাই বিশ্বাস করিল। বিভূতিকে আহার করিতে বলিল। বালক বলিল "আমি বাবার সঙ্গে খাব।" বিজলী অনেক প্রকারে তাহাকে ভুলাইয়া আহার করাইয়া শয়ন করাইল। বালক পিতার কথা কহিতে কহিতে নিদ্রাগত হইল।

দেখিতে দেখিতে রাত্রি প্রগাঢ় হইল, ক্রমে অম্বিকার আসিবার আশা গেল। এখনও বিরজাও বিজলী জাগরীত। বিজলী বিরজাকে আহার করাইতে অনেক চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইল না, সুতরাং বিজলীরও আহার হইল না। ইহা আজি নূতন নয়, প্রায় ছয় মাস হইতে মধ্যে মধ্যে এরূপ হইয়া আসিতেছে। কাহারও নিদ্রা নাই—বিরজা অবিরত কাঁদিতেছে। বিজলী কত প্রকার শান্তনা বাক্য প্রয়োগ করিল, কিন্তু প্রকৃত যাতনার শান্তনা কাছে কি? সুতরাং বিরজার হৃদয় মানিল না, তাহার যাতনার অবসান হইল না।

রাত্রি প্রভাত হইল, সপ্তমী আসিল, বিভূতি নিদ্রা ভঙ্গে ত্রস্ত ভাবে উঠিয়া "বাবা বাবা" বলিয়া ডাকিল। কেহ কোন উত্তর দিল না। বালক নিস্তব্ধ হইল, তাহার বিষণ্ণভাব দেখিয়া বিরজার চক্ষে জল আসিল, বিজলীও চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারিল না; কিন্তু পাছে তাহার চক্ষে জল দেখিয়া বিভূতী আরও কাঁদে এই আশঙ্কায় সে শয্যা হইতে উঠিয়া স্থানান্তরে গেল।

ক্রমে সপ্তমীও গেল, অষ্টমী আসিল, তাহাও শেষ হইল।

আজি নবমী, বেলা অপরাহ্ণ—এমত সময়ে অম্বিকাচরণ টলিতে টলিতে গৃহপ্রবেশ করিলেন। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বিরজার হৃদয় বিদীর্ণ হইল। কিন্তু সতী তাহা সহ্য করিলেন, বিরক্ত হইলেন না, সাহ্লাদে স্বামীর নিকটে গেলেন।

বিরজাকে দেখিয়া অম্বিকা মৃদু হাসিয়া বলিল "আমি এসেছি।"

বিরজা। তুমি না আসিবে ত কে আসিবে—এসংসারে আর আমার কে আছে?

বিভূতি "বাবা বাবা" বলিয়া নিকটে আসিল।

বালক ভাবিল পিতা কত সোহাগ করিবেন, কিন্তু অম্বিক প্রতি উত্তরে বিরক্তি সহকারে বলিলেন "কি?"

বালক স্তম্ভিত হইল, কি উত্তর দিবে স্থির করিতে না পারিয়া বলিল "আমি—আ—"

অম্বিকা সে কথায় বাধা দিয়া বলিলেন "ব্যস্ত করিসনে।"

বালক কুণ্ঠিত ও বিষাদিত হইয়া সরিয়া গেল।

অম্বিকা। বিরজা দশটা টাকা দিতে পার?

বিরজা শশব্যস্তে টাকা কয়টী আনিয়া তাঁহার হস্তে দিল, অম্বিকা টাকা কয়টী লইয়া বলিলেন "আমি কেন টাকা লইতেছি জিজ্ঞাসা করিলে না?"

বিরজা। আবশ্যক আছে তাই লইতেছ, তা আবার জিজ্ঞাসা করিব কি, যতক্ষণ আমার আছে ততক্ষণ দিব। যখন না থাকিলে তুমি দিবে?

অম্বিকা। আমি? না না তা দিব না, কোথায় পাব? আমার টাকার এখন বড় দরকার। প্রায়ই বন্ধুবান্ধব নিয়ে

আমোদ করতে হয়, আর না করে করি কি? সেই জন্য দেখতে পাও না যে তোমার কাছ থেকে প্রায়ই টাকা নিয়ে যাই।

বিরজা। যষ্ঠির দিন আস্‌ব বলে ছিলে এলে না কেন? তোমায় না দেখ্‌লে যে বড় কষ্ট হয়, প্রাণ যে ফেটে যায়।

বিরজা কাঁদিল।

অম্বিকা। এইত এসেছি, কিন্তু এখন চল্‌লাম।

বিরজা। এখনি!

অম্বিকা। হাঁ এখনি।

বিরজা আকুল ভাবে কহিলেন "আজ থাক, তোমার পায়ে পড়ি আজ থাক।"

অম্বিকা ভ্রূকুটি করিয়াকহিলেন "তোমারটাকা কটা নিয়েছি বলে যেতে দিতে কষ্টহচ্চে না কি?"

বিরজা চক্ষের জল মুছিয়া বলিল "তবে জল খেয়ে যাও।"

অম্বিকা "না" বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

বিরজা ভগ্নোৎসাহ ও মর্ম্মপীড়িত হইয়া আপন শয্যায় যাইয়া কাঁদিতে লাগিল। বালক বিভূতী স্তম্ভিত ও ব্যাকুল চিত্ত হইয়া বিজলীকে মৃদুস্বরে কহিল "বাবা কোথা গেল বড় মা।" বিজলী সে কথার আর কোন উত্তর দিল না, কিন্তু তাহার সজল চক্ষু সে কথার উত্তর দিতে বিরত হইল না। বালক তাহা বুঝিল কি? বুঝিল বই কি, বিভূতী কাঁদিয়া আকুল হইল।

বিংশতি পরিচ্ছেদ।

—:০:—

দুঃখের উপর দুঃখ।

দুর্গাপূজা ছয় মাস হইল অতীত হইয়াছে। অম্বিকার এখন আর হিতাহিত জ্ঞান নাই, টাকা পাইলেই লইয়া যায়, এবং টাকা চাহিবামাত্র বিরজাও দেয়। স্বামীর নিকট গোপন করিতে এত শিখিয়াও পারিল না!

বিরজা এখন দিবা রাত্র পরিশ্রম করে, শুদ্ধ আপনার ভরণ-পোষণ ভার নহে, অম্বিকার আর্থিক স্বেচ্ছাচারিতার অভাব মোচন করিতে হয়। এই দুর্নিবার পেষণে কখন কখন বিরজাকে উপবাসে দিন কাটাইতে হয়। এই দারুণ দুশ্চিন্তা ও ক্লেশে আমাদের চিরদুঃখিনী বিরজার দিন কাটিতেছে, ইহাতেও বিরজার স্বামীর প্রতি অনাস্থা নাই, বরং তাঁহার প্রতি আরও ভাল বাসা বাড়িয়াছে,——সহানুভূতি দ্বিগুণিত হইয়াছে।

সন্ধ্যাকাল, বিজলী বিভূতিকে ক্রোড়ে করিয়া ঘুম পাড়াইতেছে এবং বিরজা এক মনে একটি জামায় জরির কার্য্য করিতেছে, এমত সময়ে গৃহ মধ্যে অম্বিকাচরণ প্রবেশ করিলেন। বিরজা ব্যস্ত ভাবে কার্য্য ফেলিয়া স্বামীকে বসিতে আসন দিল। এ অম্বিকা আর যেন আমাদের সে অম্বিকা নয়, সেই দেহে যেন অন্য হৃদয়ের আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

সে শ্রী নাই, সে লাবণ্য নাই, মুখ ভাবের সেই অপূর্ব্ব সারল্য নাই, সকলেরই যেন ঘোর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে

অম্বিকার হৃদয় হইতে কি ভালবাসা একেবারে তিরোহিত হইয়াছে? না তাহা নয়—অত্যাচার যাতনায় তাহার মানসিক বিকৃতি জন্মিয়াছে, হৃদয়ের ভালবাসা অবস্থান্তরে অবস্থান্তর ধারণ করিয়াছে, অম্বিকা দেবতা হইতে একেবারে পশুভাবাপন্ন হইয়াছেন।

অম্বিকা বলিলেন "বিরজা, আমি কেন আসিয়াছি বল দেখি?"

বিরজা। বিভূতিকে দেখিতে।

অম্বিকা। বিভূতিকে দেখিয়া কি আমার স্বর্গলাভ হইবে?

বিরজা নিরুত্তর।

অম্বিকা। আমায় কিছু টাকা দিতে পার?

বিরজা নিতান্ত কুণ্ঠিত হইয়া বলিল "টাকা ত নাই।"

অম্বিকা। নাই!

বিরজা। একটী তামার পয়সা নাই।

অম্বিকা। তবে কি কাজ কর?

বিরজার বড় দুঃখ হইল, দিবারাত্র পরিশ্রম, ইহাতেও অভিযোগ। চক্ষে জল আসিল, সে জল বহু কষ্টে দমন করিয়া ভাবিল কাহার উপর বা অভিমান।

অম্বিকা বিরজার হস্তস্থিত জামাটিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল "এ জামাটা বিক্রি করনাই কেন?"

বিরজা। কাল বিক্রি হবে।

অম্বিকা। আজ আমার আবশ্যক কাল হলে হবে কি?

বিরজা। কাজত এখনও শেষ হয় নাই।

অম্বিকা। দেখি।

বিরজা জামাটি স্বামীর হস্তে দিল।

অম্বিকা। আচ্ছা আমি বেচ্‌ব, তোমায় কষ্ট কর্‌তে হবেনা।

বিরজা। ওযে ফরমাশি জামা।

অম্বিকা। তাকে আর একটা তৈয়ার করে দিও।

বিরজা আকুলভাবে সজলনেত্রে কহিল "আমি কোথায় পাব, আমার পুঁজির কয়টী টাকাও যে ঐতে আছে। আমার পরিশ্রমের টাকা তুমি নাও, পুঁজি গেলে আমরা যে না খেতে পেয়ে মারা যাব।"

অম্বিকা তাহার কোন উত্তর না দিয়া হা হা করিয়া হাসিয়া চলিয়া গেলেন, বিরজার মস্তকে যেন বজ্রপাত হইল, এতদিন তাহার কিছুতেই দুঃখ হয় নাই, আজি তাহার মর্ম্মান্তিক দুঃখ হইল, কি হইবে কি করিয়া বিভূতিকে বাঁচাইবে, এই চিন্তাই তাহার নিদারুণ হইল।

বিজলী নিকটে বসিয়া সমস্তই দেখিল, কিন্তু একটি কথাও বলিল না।

পর দিবস হইতে সামান্য তৈজস পত্র যাহা কিছু ছিল তাহাই বিক্রয় করিয়া আপনারা একসন্ধ্যা অন্নমাত্র আহার করিয়া বিভূতির জন্য ভাবিতে ভাবিতে দিন কাটাইতে লাগিলেন। কাজ কর্ম্ম বন্ধ হইল। লোকে বিশ্বাস করিয়া আর কেহ কাজ দিলনা, সকলেই জামিন চায়, কিন্তু অভাগিনী বিরজার জামিন কে?

আর কি, যাহা কিছু ছিল তাহাও শেষ হইল, আর দিন চলেনা, কালি কি হইবে তাহার স্থির নাই। দোকানদারেরা যে সামান্য ধার দিত তাহাও বন্ধ করিল, ঘরে এমন কিছু নাই

যাহাতে সে দিন চলে। বিজলী ভিক্ষা করিয়া দুইটি পয়সা আনিয়াছিল তাহাতেই বিভূতি সে দিন উপবাসে রহিল না। আবার রাক্ষসী দিবা আসিল, সর্ব্বসন্তাপহারিণী নিশা ধীরে ধীরে আপন মোহকর আবরণী উত্তোলন করিয়া পৃথিবীর নিকট নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য বিদায় লইলেন। আবার বিরজা ও বিজলীর মস্তক ঘুরিয়া গেল, কি হইবে, কি করিয়া দিন কাটিবে; বালক প্রাতে উঠিয়া "মা ক্ষিধে পেয়েছে" বলিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করে, সে কি জানে যে আহার এত দুষ্প্রাপ্য বস্তু। সে কি জানে যে তাহার পিতা এত পশুভাবাপন্ন হইয়াছেন?

বিরজার চক্ষের জল আর শুষ্ক হয় না। বিজলী আবার ভিক্ষার বাহির হইল, কিন্তু ভিক্ষা করে কোথায়? স্ত্রীলোক না দেখিলে চাহিতে পারে না। ভিক্ষা করা কি বিরজা বা বিজলীর কর্ম্ম, কিন্তু বিধাতা তুমি তাহাদের ললাটে তাহাও লিখিয়াছ!

বেলা প্রায় দুই প্রহর, এখনও দুধের ছেলে জল খায় নাই-- এমত সময়ে গৃহ মধ্যে কে প্রবেশ করিল, বিরজা চিনিল যে তাহার পিতা গোপালচন্দ্র; শশব্যস্তে তাঁহাকে বসিতে আসন দিল।

গোপালচন্দ্র মৃদু হাসিয়া বলিলেন "কেমন বিরজা যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহা ঘটিয়াছে ত?' ভিক্ষা পর্য্যন্ত করিতে হইল! এই তোমায় অম্বিকা ভালবাসে, এই ভালবাসার জন্য তুমি পাগল, আমি সকল কথাই বিজলীর নিকট এই মাত্র শুনিয়াছি।"

বিরজা তাহার কোন উত্তর দিলনা, কেবল অঘোরে কাঁদিতে লাগিল।

গোপাল। এখনও যদি চেতনা হইয়া থাকে তবে আমার সহিত দেশে চল, আমার যাহা কিছু আছে সকলই তোমার।

বিরজা। আমি কি করিয়া যাই?

গোপাল। কেন?

বিরজা। তাঁহাকে ফেলিয়া?

গোপাল। সে হতভাগার সহিত সম্বন্ধ থাকিতে আমি তোমার কোন উপকার করিব না।

বিরজা। আমার না করেন, আমার ছেলের করুন, বাছা আমার এখনও জল খায় নাই।

বিরজা কাঁদিতে লাগিল। চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

গোপাল। না বিরজা, আমি ওসকল ভাল বুঝি না তুমি অম্বিকাকে ছাড়িবে?

বিরজা। আমি তাহা পারিব না।

গোপাল। এই কষ্ট ভোগ করিবে?

বিরজা। এই কষ্টই আমার স্বর্গ।

গোপাল। তবে স্বর্গ সুখ ভোগ কর।

বিরজা ক্রন্দনে বলিল "বাবা বিভূতির উপায় করুন।"

গোপাল। তোমার ছেলে আমার কেহ নয়।

গোপাল এই বলিয়া রাগভরে চলিয়া গেলেন। বিরজা সন্তানের মুখচুম্বন করিয়া অঝোরে কাঁদিতে লাগিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

সুখের সূত্র।

বিমলী চিরকাল বুদ্ধিমতী, গোপালের একটী কথাতেই বুঝিয়াছিল যে ইহার দ্বারা কোন উপকার সম্ভবিবে না। বিমলী তখন পর্য্যন্ত একটী পয়সাও ভিক্ষা পায় নাই, সুতরাং তাঁহার সহিত অধিক কথা কহিয়া সময় নষ্ট না করিয়া, সজল চক্ষে ভিক্ষা প্রাপ্তি আশায় ছুটিল, গত দিবস হইতে তাহার আহার হয় নাই, তাহা মনেও নাই, বিভূতির আহারোপযোগী কিছু পাইলেই হয়।

অনেক বেলা হইয়াছে, দুইপ্রহর অতীত হইয়া, দুই দণ্ড হইয়াছে, বাছা না জানি কি করিতেছে, কিন্তু তখনও ভিক্ষা পায় নাই, রাস্তায় একটী স্ত্রীলোক নাই, হিন্দু অতি অল্প, মুসলমানই অধিক, ভিক্ষা চাহিলে তাহারা পরিহাস বিদ্রূপ করে; অথচ ভিক্ষা চাই-ই! দুই একটী ভদ্রলোকের নিকট ভিক্ষা চাই চাই করিয়া লজ্জায় চাহিতে পারিল না। এবার ভদ্রলোক দেখিলেই চাহিবে, ইহাই স্থির করিল।

বিমলী যাইতে যাইতে একটী সুন্দর অট্টালিকা দেখিতে পাইল, দেখিল, বাটিটী বাঙ্গালির।—বাটির সম্মুখ ভাগে প্রহরী ও বহুলোকের জনতা দেখিয়া, কোন বড়লোক যে ইহার অধিকারী তাহাতে আর সন্দেহ রহিল না। অনেক লোক জন দেখিয়া বিমলী প্রথমতঃ প্রবেশ করিতে বড়ই লজ্জা বোধ করিতে লাগিল, আবার ভাবিল আমার লজ্জার জন্য

বাছা আমার মারা যাইবে, আবার কি ভাবিয়া নিকটবর্ত্তী টী বৃক্ষ তলে উপবেশন করিল।

বিজলীর দুই গণ্ড হইতে তপ্ত অশ্রুধারা প্রবাহিত হইতেছে, ন সময়ে একটী স্ত্রীলোক আসিয়া বলিল "ওগো, তুমি ক গা?"

বিজলী। কেন মা।

স্ত্রীলোক। রাণী মা তোমায় ডাক্‌চেন।

বিজলী। রাণী মা কে মা?

স্ত্রীলোক। কৃষ্ণনগরের মহারাণী।

বিজলী যেন স্বর্গ হাত বাড়াইয়া পাইল। বলিল "তিনি কবে এলেন?"

স্ত্রীলোক। তীর্থ কর্‌তে গিয়েছিলেন কাল এসেছেন।

বিজলী আর কোন কথা না কহিয়া তাহার অনুসরণ করিল, দাসী তাহাকে মহারাণীর নিকট লইয়া গেল।

মহারাণী তাহাকে দেখিয়া বলিলেন "বিজলী তোমার এ দশা কেন?"

বিজলী অনেক কোন কথা কহিতে পারিল না, কেবল তাঁহার বদন প্রতি চাহিয়া অনিমেষ লোচনে কাঁদিতে লাগিল।

মহারাণী। কাঁদিও না, তোমার ক্রন্দন দেখিয়া আমার বড় ক্লেশ হইতেছে।

তখন বিজলী মহারাণীর পদপ্রান্তে পতিত হইয়া সরোদনে সকল ঘটনা বিবৃত করিল।

মহারাণী বসনাঞ্চলে চক্ষের জল মুছিয়া বলিলেন "আমায় বিভূতির এমন দশা হইয়াছে, আমরা কি জানি যেনবাব

অম্বিকাকে গেপ্তার করিয়াছিলেন, আমরা মনে করিলাম তোমরা হয়ত আসিলে না।"

মহারাণী আর কোন কথা কহিলেন না, বিরজার অকৃত্রিম স্বামী ভক্তি দেখিয়া, তাহার প্রতি স্নেহ ও মমতা দ্বিগুণিত হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ শিবিকা ও দাস দাসী পাঠাইয়া বিরজাকে আনিতে পাঠাইলেন। বিমলাও তাহাদের সঙ্গে একখানি স্বতন্ত্র শিবিকা করিয়া গেল। তাহার সহিত প্রচুর আহার্য্য সামগ্রী ও বসন ভূষন প্রভৃতি প্রেরিত হইল। যথা সময়ে বিরজা ও বিভূতি আসিয়া মহারাণীর চরণে প্রণাম করিল। মহারাণী সস্নেহে বিভূতিকে ক্রোড়ে করিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিলেন এবং অম্বিকার ন্যায্য বিচার যাহাতে হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ করিবেন বলিয়া বিরজাকে সান্ত্বনা করিলেন। বিরজা তাঁহার মধুর বাক্যে অনেক আশ্বস্ত হইলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

—০*০—

দম্পতি-সুখ।

পাঠক! গোপালের বিবাহের কথা আপনি অবগত আছেন, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে কি সুখে বিবাহ করিয়াছে ও কি সুখ পাইয়াছে, তদ্বিষয়ে আপনাকে কিছু না বলা ভাল হইতেছে না।

গোপাল চন্দ্রের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর চরিত্র বর্ণিত করিতে

গেলে, অনেক কথা পাঠককে না বলাই কর্ত্তব্য, কিন্তু না বলিলেও সে চরিত্রের প্রস্ফুটন হয় না, সুতরাং পাঠক মার্জ্জনা করিবেন, অশ্লীলতা দোষে দূষিত বলিয়া আমাদিগকে তিরস্কার করিবেন না।

আজ কাল বেশ্যার কথা উত্থাপন করিলে অনেকে "অশ্লীলতা অশ্লীলতা" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠেন, কিন্তু বেশ্যা চরিত্র কি চিত্রিত করিয়া ফল নাই?—তাই বলি অশ্লীলতা অন্য পদার্থ। পাঠক, সেই কথাটী স্মরণ করিয়া আমাদের মোক্ষদা সুন্দরীকে দেখিবেন। চরিত্র দেখাইতে যদ্যপি অশ্লীলতার ছায়া আসিয়া পড়ে তাহা হইলে ক্ষমা করিবেন।

এক দিন সন্ধ্যার সময় গোপালচন্দ্র স্বীয় কার্য্য হইতে অবসর পাইয়া গৃহে আসিলেন। সযৌবনা স্ত্রী মোক্ষদাসুন্দরী আপন রূপালোকে গৃহ আলোকিত করিয়া রহিয়াছে। বৃদ্ধের সুন্দরী সযৌবনা স্ত্রী যে কি আদরের সামগ্রী, কি আঁধার ঘরের আলোক, কি সাত রাজার ধন মাণিক, তাহা আর বিচক্ষণ পাঠককে বলিতে হইবে না। বৃদ্ধ আসিয়া ক্ষণেক হাঁ করিয়া তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল।

মোক্ষদা সেই গোলাপী অধরে মৃদু হাসিয়া বলিল "আ-মরণ হাঁ করে দেখ্‌ছ কি?"

গোপাল। তোমায় দেখ্‌ছি।

মোক্ষদা। আমায় দেখে কি রাঁধা হবে? হাত পা ধোওগে না।

গোপাল হস্তপদ প্রক্ষালন করিয়া আসিয়া বলিলেন 'জল খাবার দাও।

মোক্ষদা। ঐ আছে খাওনা।

গোপাল। তুমি দিতে পার না?

মোক্ষদা। আমার অত রস গড়ায় নি?

গোপাল। দেখ তুমি আমায় যত্ন করে খাবার কি পানটী দিলে আমার কত আহ্লাদ হয়, তা দিয়ে কি তুমি আমায় সুখী করিতে পার না?

মোক্ষদা। পারব না কেন, সব পারি, তোমায় পারিনে।

গোপাল। কেন পারনা মোক্ষদা, আমি কি করেছি?

মোক্ষদা। করবে আবার কি।

গোপাল। তবে কেন পার না?

মোক্ষদা। আমার ইচ্ছে, আমার খুসী।

গোপাল একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "বটে!"

মোক্ষদা। বটে নয়ত কি? বিয়ে করতে গেছলে কেন?

গোপাল। তোমার কিসের অভাব, বিয়ে করে তোমায় কি অসুখী করেছি।

মোক্ষদা। তোমার মত যার স্বামী তার আবার অসুখের বাকি কি?

গোপাল। কেন?

মোক্ষদা মুখ নাড়িয়া বলিল "কেন তা আমি জানিনে।"

গোপাল। তা বলতেই হবে।

মোক্ষদা। আ পোড়ায় মুখ, কেবল গিলতেই জান। এই সামান্য কথাটী বুঝতে পারলে না? তুমি না জান কথা কইতে, না জান ভালবাসতে, না জান সোহাগ করতে, না

জান মান ভাঙ্গাতে, তোমার আবার কি গুণ আছে, যে স্ত্রী দড়াদড়ি ছিড়ে ঐ তোবড়া গালের দাসী হবে? স্ত্রীর ভালবাসা স্বামী নিতে না জান্‌লে কি স্ত্রী দিতে জানে, যে নৌকার মাঝি ভাল, তার সব ভাল, আর যার তোমার মত হস্তি মুর্খ মাঝি, তার মাঝ্‌ দরিয়ায় ভরা ডুবি।

গোপাল। তা আমি জানিনা বটে, আচ্ছা মোক্ষদা তবে তুমি আমায় ওসব শেখাও না কেন?

মোক্ষদা। আ মরণ, আমি শেখাব, বাহাত্তুরে হয়ে মর্‌তে যাচ্চ শিখতে পারনি, এখন শিখ্‌বে। বল্‌তে লজ্জা করে না? আমি আবার শেখাব, তেমন লোক পেলে আমরা কত শিখ্‌তাম।

গোপাল। লোক পাওনা না কি?

মোক্ষদা। মরণ খুঁত ধর্‌তেই জানেন, আমি তা বল্‌লাম, না, বল্‌লাম তুমি যদি লোকের মত লোক হতে তা হলে এত দিন কত শিখ্‌তাম। যুবতী আর ছেলে রোজ নূতন নূতন শিখ্‌তে চায়।

গোপাল। তোমার বড় রাগ, আমায় বড় গাল দাও।

মোক্ষদা। সাধে দি,—হাড় জ্বলে বলে দি। নইলে কি সাধ।

গোপাল। লোকে তোমার কত নিন্দে করে।

মোক্ষদা। তোমায় গাল দি বলে?

গোপাল। হাঁ।

মোক্ষদা। তোমার মত বুড়রাই করে,—ছোঁড়ারা হাসে!

গোপাল। সে দিন তুমি যে করেছিলে?

মোক্ষদা। সাধে করে ছিলাম, উঁনি ওঁর মেয়েকে আন্‌বেন বাড়িতে রাখ্‌বেন, আর আমি ওঁর পুজো করবো। আ মরণ—

"সতিনের ঘা সইতে পারি।
সতিন্ কাঁটা সইতে নারি॥"

গোপাল। আমি কথার কথা বলেছিলাম বইত নয়।

মোক্ষদা বিকৃত মুখভঙ্গি করিয়া কহিল, "কি আমার কথার কথা, কি আমার কথা কইয়ে রসিক পঞ্চানন্‌রে।"

গোপাল। তুমি যা কর তা কর কিন্তু বিজয় বাবুর সঙ্গে কথা কয়ওনা।

মোক্ষদা। কেন কব না, ইস্‌ কি আমায় শাস্তে এলেন, আমার খুসী কবো। চিরকাল কথা কয়ে এলাম, এখন কথা কব না, সে ভদ্র লোকের ছেলে কি মনে কর্‌বে, তোমার এত যদি সন্দেহ তবে গোড়ায় বারণ কর্‌তে পারনি। গোড়া কেটে আগায় জল ঢালা আমার দুচক্ষের বিষ।

গোপাল একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। মোক্ষদা রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে স্থানান্তরে গমন করিল

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

প্রতিবিধান।

মোক্ষদা স্থানান্তরে গমন করিলে গোপালচন্দ্র অনেক ক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে উপবিষ্ট হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে—"বিবাহ করিয়া কি মহাপাপ করিয়াছি, ছিলাম স্বাধীন, হইলাম পরাধীন, কোথাও যাইয়া তৃপ্তি নাই; না দেখিলেও থাকিতে পারি না,—দেখিয়াও সুখ পাই না। আমি উহাকে যেরূপ ভালবাসি, মোক্ষদা যদি তাহার একচতুর্থাংশ আমায় ভালবাসিত, তাহা হইলে আমার সুখ ধরিত না। কিন্তু সকলই তাহার বিপরীত, মোক্ষদা আমায় দুই চক্ষে দেখিতে পারে না। মোক্ষদা আমায় কি বলিল বুঝিলাম না, পাছে জিজ্ঞাসা করিলে পাছে আরও অপরাধ মনে করে বলিয়া কিছু বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসাও করিতে পারিলাম না। কে জানে রমণী তোমার কেমন মন, আর পোড়া পুরুষ তোমার মনও ধন্য, যে এত লাঞ্ছিত হইয়াও ভালবাসিতে চাও। অনেকে বলে আমি স্ত্রী-শাসন করিতে জানি না, সেই জন্য স্ত্রী আমার অবাধ্য—কিরূপে স্ত্রী-শাসন করিব? প্রহারে? তাহা হইলে আর রক্ষা থাকিবে! লোকে আমার মত গোবাঘা স্ত্রীর হাতে পড়ে, তা হলে বুঝি কেমন তাহারা স্ত্রী-শাসন করে। আমারই কি স্ত্রী ছিলনা, সে কত বাধ্য ছিল, আহা সে আমার—"

গোপালের চক্ষে জল আসিল।

গোপাল আবার কি ভাবিয়া বলিলেন "তাইত মোক্ষদা এত ক্ষণ কি করিতেছে, আমি তাহার নিকট যাইব কি, হয়ত মারিতে আসিবে, আগে আসুক, আমি তাহার পায় ধরিয়া বলিব তুমি আমায় ভালবাস, ভালবাসা ব্যতীত কি সুখ আছে, স্ত্রী হাতের পুতুল না হইলে কি তৃপ্তি আছে? আমি যাই, রাগ করে করিবে। মোক্ষদার চরিত্রে আমি কখন সন্দেহ করিব না।"

বৃদ্ধ ধীরে ধীরে উঠিল, নীচের গেল, দেখিল তথায় কেহ নাই, কেবল দাসী গৃহকার্য্য করিতেছে,—গোপাল তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া নিস্তব্ধ ভাবে আরও কতকদূর যাইয়া দেখিলেন যে খিড়কির দ্বার উন্মুক্ত, দ্বারের পার্শ্বে গেলেন, দেখিলেন মোক্ষদা বিজয়ের সহিত মৃদুস্বরে কথাবার্ত্তা কহিতেছে।—গোপাল আত্মগোপন করিয়া নিভৃত হইতে তাহাদের কথোপকথন শুনিতে লাগিলেন।—তাহা এইরূপ—

মোক্ষদা। বিজয়, প্রাণেশ্বর!

বিজয়। কেন প্রিয়ে, কেন মোক্ষদা?

মোক্ষদা। তোমার আর যাইয়া কাজ নাই, থাক, ও শুলেই ঘুমুবে।

বিজয়। আমি আজ যাই, কাল আসব, আজ কাল রাত্রে বাবা বড় খোঁজ করেন, তাঁর মনে বড় সন্দেহ হয়েছে।

মোক্ষদা। না বিজয়, তা আমি থাকিতে পারিব না—তুমি হয়ত আসিবে না,—তোমায় না দেখিলে আমার প্রাণ যে কি করে, আমি যে কি দুর্দ্দম যাতনা ভোগ করি, তাহা আমি জানি, আর সেই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরই জানেন।

বিজয়। মোক্ষদা প্রাণেশ্বরি, আমিও যে তোমায় কত ভালবাসি তাকি তুমি জান না, আমি তোমায় নিয়ে বনচারী হ'তে পারি।

মোক্ষদা। তা না হলে আমি তোমার দাসী কেন?

বিজয়। মিনুশে যে নিপাত গেলে আমরা সুখে রাজ্যভোগ করি।

মোক্ষদা বিজয়ের স্কন্ধে স্বীয় মস্তক ন্যস্ত করিয়া কহিল "ও যে ভাই যমের অরুচি, ও কি এখনি যাবে।"

বিজয়। দেখ মোক্ষদা, আমি কেবল তোমার মুখ চেয়ে বিবাহ কর্‌লাম না, তোমায় ছেড়ে আমি এক দণ্ড কোথাও থাক্‌তে পারি না। কুহকিনী তুমি সত্য বল, কি কুহক জান।

মোক্ষদা। সে বিদ্যা তোমার, তা না হলে কুলকামিনী তোমার জন্য এত পাগল।

বিজয়। আমাদের শত মন্ত্র—তোমাদের এক কটাক্ষে নয় দূর, মোক্ষদা তুমি ঘোর মায়াবিনী, আমি তোমার মোহিনী মায়ায় মুগ্ধ।

এই বলিয়া বিজয় তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া মুখচুম্বন করিলেন। এই সময়ে গোপালচন্দ্রের মনে যে কি ভাবের উদয় হইতেছিল তাহা বলা যায় না।—একবার মনে করিল, বাহির হইয়া তিরস্কার করি—আবার ভাবিল, তাহাতে ফল কি? আবার ভাবিল হত্যা করি, আমার সুখের কণ্টক পরিস্কার করি—আবার ভাবিল, হত্যা করিয়া কি নিজের প্রাণ নষ্ট করিব। শেষ স্থির হইল যদি হত্যা করিতে হয়

ভাবে গোপনে। কেহ জানিবে না অথচ কার্য্যসিদ্ধ হইবে। গোপাল আবার নিস্তব্ধ হইয়া কথা শুনিতে লাগিল।

মোক্ষদা বলিল—"ভাই ঈশ্বরের এমন বিচার কেন?—আমার দিয়েছে ঐ মিন্সেটা—যদি তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হত তা হলে আমার চেয়ে সুখী এ পৃথিবীতে আর কেউ থাক্ত না।

মোক্ষদা কাঁদিল। বিষয় স্বীয় বসন প্রান্ত দ্বারা তাহার চক্ষের জল মুছাইয়া দিয়া বলিলেন "কেঁদনা।"

মোক্ষদা। না কেঁদে যে থাকৃতে পারি না ভাই; ওকে দেখ্‌লে যে প্রাণ কেমন করে। কি যাতনা যে হয় তা আর কি বল্‌ব। ভাই, কেন তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'ল না?

বিষয়। এত বিবাহই—

মোক্ষদা। তা বটে তবু—

বিষয় মনে মনে বলিল "কি পাগল! আমার স্ত্রী হবে, আমি একে বিবাহ করব—মরণ আর কি, যে কদিন যৌবন সেই কদিন সোহাগ—মধু নিয়ে ভ্রমরের সম্বন্ধ। লোকে বলে রমণী পুরুষকে বশ করে, ছাই করে—সে কেবল দুদিন, তার পর বিতৃষ্ণা, তবে রমণী বটে চিরকাল মরমে মরে—এটাই উচিত, যেমন কাজ তেমনি ফল।"—প্রকাশ্যে বলিল—"তবে এখন আসি।"

মোক্ষদা। কাল কখন আসিবে?

বিষয়। ঠিক রাত্রি ১টার সময়।

মোক্ষদা। নিশ্চয়?

বিষয়। নিশ্চয়।

মোক্ষদা। দেখো আমার মাথা খাবে।

বিজয়। বালাই তোমার শত্রুর মাথা খাই, নিজের মাথা খাই।

মোক্ষদা হাসিয়া বলিল "দেখ ভাই যদি পার, আমিত হার মেনেছি।"

বিজয় মোক্ষদাকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া প্রস্থান করিলেন। মোক্ষদা একটী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

চতুর্স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

সোহাগ।

মোক্ষদা সেখান হইতে ধীরে ধীরে রন্ধনশালায় গেল, এই অবকাশে গোপাল স্বীয় হৃদয়ভাব বহন করিয়া আপন শয্যায় যাইয়া শয়ন করিল। গোপাল প্রকৃতিস্থ হইতে অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না; অবাধে নয়নযুগল হইতে বারি সম্পাত হইতে লাগিল। আপন স্ত্রী হইয়া এই কথা! এই কাল ভুজঙ্গিনীর সহিত আমি বাস করি, দুশ্চরিত্রা স্ত্রী অনায়াসে স্বামী হত্যা করিতে পারে। গোপাল অনেকক্ষণ এই সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া, বলিলেন "হত্যা করিতে পারে না, যে সকল পুরুষের চরিত্র মন্দ তাহারা কি আপন স্ত্রীকে

হত্যা করে।” আবার ভাবিলেন “না না সে সতন্ত্র কথা, স্ত্রী পুরুষে অনেক প্রভেদ।”

গোপালচন্দ্র আবার নিস্তব্ধ ভাবে কি ভাবিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার বক্ষ দুর্ দুর্ করিতেছে, নিশ্বাস সঘন বহিতেছে। কপাল উষ্ণ, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে সে সময় তাঁহাকে কোন ডাক্তার পরীক্ষা করিলে নিশ্চয়ই তাঁহার জ্বর হইয়াছে বলিয়া স্থির করিতেন।

গোপালচন্দ্রের বিদগ্ধ হৃদয়ে তখন পূর্ব্ব স্ত্রীর সরল মূর্ত্তি উদয় হইল, তিনি সেই পতিপ্রাণার জন্য আকুলভাবে কাঁদিলেন. কিন্তু কাঁদিয়াও সুখ নাই, কত বার ত্রস্তভাবে উঠিয়া মোক্ষদা রন্ধনশালায় আছে কিনা দেখিতে লাগিলেন। গোপাল একবার বিরজাকে ভাবিলেন, তাঁহার অকৃত্রিম পতি-প্রেমের কথা হৃদয়ে আবির্ভাব হইল, কি মনে হইল জানি না, বৃদ্ধ কাঁদিয়া ফেলিলেন, করপুটে ঈশ্বরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। তখনি আবার মোক্ষদাকে স্মরণ হইল, সেই বিদগ্ধ হৃদয় যেন আবার জলিয়া উঠিল, গোপালচন্দ্র তাহার প্রদাহনে অস্থির হইয়া উঠিলেন।

এমত সময়ে নিচে হইতে মোক্ষদা মধুর স্বরে ডাকিল “নাব, পিঠি সেদ্দ হয়েছে গেলসে।”

মোক্ষদা কি রাঁধিয়াছে তাহার স্থিরতা নাই, তাহার মনে এতক্ষণ কেবল বিজয়চন্দ্রের মধুর ভাব, মধুর কথা, সুন্দর রূপে জাগিতেছিল, সে রাঁধিবে কি?

গোপালচন্দ্র অনিচ্ছা সত্বেও স্থিরভাবে যাইয়া আহার করিতে বসিলেন, মুখে একটীও কথা নাই।

মোক্ষদা বলিল "একি, কথা নাই যে, রাগ হয়েছে নাকি, মুখে যে গুলপ্ দিয়েছ।"

গোপাল। বড় অসুখ করেছে।

মোক্ষদা। তবে গিল্‌তে এলে কেন?

গোপাল। আর গিল্‌বো কি, যে রেঁধেছ।

মোক্ষদা। কেন, কি হয়েছে?

গোপাল। মাছের ঝোলে এত নুন্ যে মুখে দেওয়া যায় না। মাছ ভাজা গুলো চুঁয়ে পুড়ে গেছে।

মোক্ষদা। ওঁরই মুখ, আর ত কারও মুখ নয়—তা আমায় বলা কেন, যে ভাল রাঁধতে পারে তাকে আনতে পার না। রোজ খোঁটা, রোজ খোঁটা, আমি যেই মেয়ে তাই এত সই, অন্য কেউ হলে টের্‌টা পেতে। কথায় কথায় বলা হয় "তোমার সতিন যে রাঁধতো!" তা বলা কেন, যাওনা,—চুলো থেকে তাকে তুলে আনগে না, নয় তো তার কাছে গিয়ে মুখ বদ্‌লে এস।

গোপাল। কথা ঠিক বটে।

মোক্ষদা। আর অত আধিক্যেতার কাজ নাই, খেতে হয় খাও, না খেতে হয় উঠে যাও। হাত পুড়িয়ে মর্‌তে মর্‌তে রাঁদ্‌লুম, সেকথা চুলোয় গেল, উনি এখন দোষ ধরতে বস্‌লেন।

গোপাল। হাত পোড়াও কেন, আমি ত এক জন বামনী রাখ্‌তে বলি।

মোক্ষদা মনে মনে বলিল "মনের মত লোক পেলে ত রাখ ত" প্রকাশ্যে বলিল "আমি কোথা খুঁজবো, তুমি খুঁজে আন্‌তে পার না।"

গোপাল। কালই আনব;

মোক্ষদা। এন, তার আবার ভয় দেখান কি?

গোপাল। একি ভয় দেখান কথা হল?

মোক্ষদা। তা নয় ত কি?

গোপালচন্দ্র মনে মনে বলিল "এখন কথা কহিবার ভঙ্গি দেখ, এতক্ষণ মধুমাখা কথা বার হচ্ছিল, আমার সঙ্গে কথা কহিতে হলেই মহা বিপদ। আমার বুকে বসে দাড়ি উপড়াবে একি ভয়ানক স্ত্রীলোক। আমার কর্ম্মোচিত ফল হয়েছে বটে, এ বয়েসে বিবাহ করে যেমন শাস্তি পেতে হয় তেমনি পেলাম।"

গোপালচন্দ্র আর কোন কথা না কহিয়া ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যাহা পারিলেন আহার করিয়া আচমন করিলেন। ভাগ্য দেবতার (?) বড় সরেস পান পাইলেন, সেটী বিজয় বাবুর বাটীতে পদার্পণ হইয়াছিল বলিয়া নয় কি?

আহারান্তে উভয়ে এক শয্যায় শয়ন করিলেন, সেই দুগ্ধ ফেন-নিভ সুকোমল শয্যায় সেই শুভ্রকেশী গলিত দন্ত বৃদ্ধকে শায়িত দেখিয়া, বিজয়চন্দ্রের সেই সুগোল গঠন পরিপাটী সেই সুন্দর মধুমাখা কথা, সেই প্রাণ ভুলান সোহাগ মনে পড়িল, মোক্ষদা সুন্দরী বড়ই প্রাণে ব্যথা পাইল, বিধাতার এই অন্যায্য বিচারে বড়ই মর্ম্মাহতা হইল, বলিল "আজ যদি নাক ডাকে ত দেখতে পাবে।"

গোপাল। নাক ডাকা কি করে বন্ধ করবো।

মোক্ষদা। তবে তুমি একলা শুইও, আমি ওঘরে শোব, সারা দিন খেটে খুটে কি না ঘুমিয়ে থাকা যায়। আর ডাক বলে

ডাক, ওপাড়া থেকে শোনা যায়। তোমার সব বাড়া বাড়ী।

গোপাল আর কোন কথা কহিলেন না।

অনেকক্ষণ পরে গোপালচন্দ্রের অল্প তন্দ্রা আসিবা মাত্র, মোক্ষদা শয্যায় উঠিয়া বসিয়া বলিল.—"বাপ বাপ্ বাপ, এত পড়ারিত মানুষের হয় না। একি বাদ নাকি? নাক মুখ দিয়ে যেন ঝড় বচ্চে। নি-দন্তে বুড়ো হওয়া কি মহাপাপের কাজ রে। মুখে যেন টানাপাখা খেলচে—ঘড়র ঘপ্, ঘড়র্ ঘপ্, একি!—ছি ছি ছি, কি পোড়া কপালই করেছিলাম। মুখের গন্ধে ভূত পালায়, বলি মরুগগে-শুই, ওমা তার উপর আবার এত, গোদের উপর বিসফোড়া কি সওয়া যায়।"

গোপাল বড়ই মর্ম্মব্যথা পাইলেন, কোন কথাই কহিলেন না, কিন্তু তাঁহার চক্ষে জল আসিল।

মোক্ষদা। কাল থেকে ভাল করে মুখ ধুয়ো, যে গন্ধ, থু থু—যেন বমি আসে।

গোপাল। মুখ ধুইনে ত কি?

মোক্ষদা। তবে গন্ধ কেন?

গোপাল। কেন তা কি জানি।

মোক্ষদা। সকল গুণই আছে।

গোপাল। গুণ সকলেরই সমান।

মোক্ষদা। কেন?

গোপাল। মনে এল বলিলাম।

মোক্ষদা। এমন কি বল, যা মনে আসবে তাই বলবে,

আমি ভেসে এসেছি আর কি। বুড় বয়সে টোপর মাথায় দিয়ে পায় ধর্‌তে গেছ্‌লে কেন?

গোপাল। অপরাধ হয়েছে।

মোক্ষদা। অপরাধ বলে আমার অকল্যাণ কর্‌ছ।

গোপাল। অকল্যাণ আবার কি?

মোক্ষদা। তা বটেত—আমার আবার অকল্যাণ কি, যত কিছু ওঁর, আর ওঁর বিরজার।

গোপাল। আর ঝগড়ায় কাজ নেই, ঘুমোও।

মোক্ষদা। ঘুমুবো না তো আর কি কর্‌বো।

মোক্ষদা আবার শয়ন করিয়া বলিল "সরো।"

গোপাল। আর কোথায় সর্‌ব?

মোক্ষদা। তবে আমি শোব কোথা, পুঁটুলি হয়ে শোয়া যায় বুঝি—তাই বলনা—যে কাছে শুতে দেবে না,—আর কোন শালি তোমার কাছে শোবে!

এই বলিয়া মোক্ষদা অপর গৃহে যাইয়া শয়ন করিল। গোপাল বুঝিলেন যে ইহা কালিকে বিজয়ের সহিত মিলিত হইবার সুবিধা। তিনি আর কিছুই বলিলেন না। এরূপ কলহ মাসের অর্দ্ধেক দিন হইত। প্রতিবারেই কি একরূপ উদ্দেশ্য ছিল?—হইতেও পারে, বিচিত্র কি!

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:•:—

সাহস।

গোপালচন্দ্র পর দিবস যথা সময়ে আপন কার্য্য স্থানে গমন করিলেন, কিন্তু কিছু সকাল সকাল প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় আসিতেন, অদ্য বেলা ৩টার সময় আসিলেন।

মোক্ষদা স্বামীকে এরূপ অনিয়মিত সময়ে আসিতে দেখিয়া বলিল "এখনি যে?"

গোপাল। সহরে যেতে হবে।

মোক্ষদা। কেন?

গোপাল। বিশেষ আবশ্যক আছে।

আবশ্যক থাক্ না থাক এখন গেলে মোক্ষদা বাঁচে।

মোক্ষদা একটু বিমর্ষের ভাণ করিয়া বলিল "তবে আস্‌বে কবে।"

গোপাল। কাল।

মোক্ষদা। দেখ এস।

গোপাল। আস্‌ব।

মোক্ষদা মনে মনে বলিল "এক যাস থাকিল না কেন?" মোক্ষদা স্বামীকে জল খাবার দিল। গোপাল জলযোগ করিয়া বস্ত্রাদি পরিধানান্তে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন।

এদিকে মোক্ষদা কুন্দ দন্তে অধর টিপিয়া মৃদু হাসিয়া কেশ রচনা করিতে বসিল। দর্পণ সম্মুখে অনাবরিত বক্ষে

বসিয়া উত্তম করিয়া মনের সাধে পেটে পাড়িয়া খোঁপা বাঁধিল। প্রিয় পাঠিকাকে বলা আবশ্যক যে তখন আধুনিক কিরিঙ্গি খোঁপার প্রচলন ছিল না। মাথা বাঁধা শেষ হইলে ক্ষণেক দর্পণে আপন বদনের প্রতিবিম্ব প্রতি স্থির দৃষ্টে চাহিয়া রহিল, বলিল "আমার মুখটা কি মন্দ, কেমন দেখাচ্চে, মাইরি, আমারি মন কেমন কেমন করে, তা আবার পুরুষের!" নীরবে অনেক ক্ষণ নানা প্রকার বদন ভঙ্গি করিয়া আপন রূপের দৌড় দেখিতে লাগিল. কখন দেখিল বঙ্কিম গ্রীবায় কেমন দেখায়, চুম্বন কালে ওষ্ঠাধরের কিরূপ সৌন্দর্য্য হয়—এইরূপ আরও অনেক দেখিল, কিন্তু সকল গুলি লিখিতে লজ্জা করে।

চুলবাঁধা শেষ হইলে মোক্ষদা দিবা করিয়া শয্যা পাড়িল, উত্তম করিয়া গৃহ পরিষ্কার করিল, সুবাসিত গোলাপজল গৃহ ও শয্যায় ছিটাইয়া দিল। উত্তম করিয়া বেশম ও ময়দা দিয়া আপন অঙ্গ মার্জ্জনা করিয়া অঙ্গ ধৌত করিল। মনের মত গহনা গুলি পরিল, একখানি সুন্দর বসন পরিধান করিয়া অঙ্গে সুগন্ধি আতর লেপন করিয়া নানাবিধ মসলা সংযোগে পান সাজিতে বসিল।

পাঠক! এ সকল আয়োজন কেন তাহা বুঝিতে পারিয়াছেন কি? মোক্ষদার স্বামী আজি বিদেশে গিয়াছেন, এ অবস্থায় তাহার এ বাসরসজ্জা কি ভাল দেখায়? কিন্তু তবে মোক্ষদা এত কেন করিতেছে, অবশ্য কারণ আছে, সে কারণ,—অদ্য তথায় লম্পট বিজয়কৃষ্ণের শুভাগমন হইবে।

গৃহকার্য্য ও বেশ ভূষা সমাপিত হইলে মোক্ষদা ক্ষণেক

ছাদের উপর ভ্রমণ করিতে করিতে চন্দ্র দেবকে দেখিয়া বলিল "দেখ চাঁদ, তোমায় একলা দেখিতে ভাল লাগে না—জোড়ে! দুইজনে, মনের মতনে—আঁক্‌খু, মিন্সের সঙ্গে নয়।—ছাদে শুয়ে চাঁদের পানে চেয়ে থাক্‌তে বড় সুখ।—সন্ধ্যাত হল"—মোক্ষদা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল, তাহার দেহ যেন অবশ হইয়া আসিল, মোক্ষদা আবার বলিল

"বিজয় অনেক রাত্রে আসিবে, তাও কি হয়, এ ঘরে সে না থাক্‌লে কি ভাল লাগে? চাঁদ না দেখ্‌লে কি ভাল লাগে? দাসীকে ডাকিয়া বলিল "ওলো, ও চিন্তে—চিন্তে"!

"কি মা।"

দাসী আসিল।

মোক্ষদা। একবার বাবুদের বাড়ি যা না।

দাসী। এখন আমি তাঁর কোথা দেখা পাব?

মোক্ষদা। কেন বাড়ীতে।

দাসী। তিনি বুঝি এখন বাড়ীতে আছেন?

মোক্ষদা। আ মরণ, নেইত কি? এই যে দেখ্‌তে পাচ্চি যেন আমার চখের উপর রয়েছে।

দাসী। তোমার চখে রয়েছে বলে কি আমার চখেও থাক্‌বে।

মোক্ষদা। তোর চখে থাক্‌বে কেন লা। ফের যদি ওকথা মুখে আন্‌বি ত তোর চোক্ গেলে দেবো।

দাসী হাসিয়া বলিল, "আমার চখে কি থাক্‌তে বল্‌চি।

মোক্ষদা। তা হলেই হল, সে আমার এক্‌চেটে।"

দাসী। জন্ম জন্ম থাক্।

মোক্ষদা হাসিয়া বলিল "তোর মুখে ফুলচন্দন পড়ুক।"

দাসী। বেশ।

মোক্ষদা। সে কথা যাক্, এখন লক্ষ্মী মা আমার একবার যা। পূজার সময় তোর মেয়েকে একখানা গহনা দেব।

দাসী। তোমার ত আম্ বল্‌লে আর টান সয়না। এখন বল কি বল্‌তে হবে।

মোক্ষদা। বল্‌বি পোড়াকপালে আজ ঘরে নেই—সন্ধ্যা হলেই যেন আসে।

দাসী প্রস্থান করিল।

মোক্ষদা শশব্যস্তে উঠিয়া মুকুরে স্বীয় তাম্বুল রঞ্জিত বদন খানি দেখিতে গেল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

—০*০—

একে আর।

পাঠক! গোপালচন্দ্র কি প্রকৃতই মুর্শিদাবাদ গিয়াছেন? না, তাঁহার সে উদ্দেশ্য নাই, তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য বৈর-নির্য্যাতন, তাঁহার সাধনা শত্রু নিপাত।

গোপাল চন্দ্র বাটি হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহার একটি বন্ধুর বাটীতে গমন করিলেন, তথায় পাশা খেলা হইতেছিল,—গোপাল চিরকাল পাশাখেলাতে পটু,—পাশক্রীড়াভক্ত।— কিন্তু

আজি তাঁহার তাহাতেও অনুরাগ নাই, অনেকে তাঁহাকে খেলিতে অনুরোধ করিল, কিন্তু তিনি নানা প্রকার শারীরিক অসুস্থের ভাণ করিয়া খেলিতে অস্বীকৃত হইলেন। একবার অনেক পীড়াপীড়িতে খেলিতে বসিলেন, কিন্তু হাত আর খুলে না, যদিও বা হাত খুলিল, তথাপি আড়ি মারিতে পারেন না। তাঁহার সে-পাঞ্জা ফাঁক যায় না, তাঁহার আজ পোহাবারুর কচেবার পড়িতে লাগিল। গুটী চালিতে তের ঘরে এগার ঘর হইতে লাগিল।

রাত্রি নয়টার সময় গোপাল তথা হইতে বিদায় লইয়া বাটীর দিকে আসিলেন। বাটীর পশ্চাতেই খিড়কির দ্বার, তাহার পার্শ্বেই একটী ঝোঁপ। তাহারই অনতিদূরে একটি বৃহৎ বৃক্ষ ছিল, গোপালচন্দ্র একটি শাণিত ভোজালিয়া হস্তে তাহারই পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। বৃক্ষটী ঠিক রাস্তার উপর।

তখন চন্দ্রদেব অস্ত গিয়াছেন, সুনীল গগনে অগণ্য নক্ষত্র বাহির হইয়াছে, গোপালচন্দ্রের চতুর্দ্দিকে অগণ্য ঝিল্লি ডাকিতেছে। গোপাল সেই বৃক্ষান্তরাল হইতে আপন শয়ন কক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন,—দেখিলেন তাহার বাতায়ন উন্মুক্ত, গৃহমধ্যে দীপ জ্বলিতেছে। কক্ষের সুধাধবলিত দেওয়ালে মধ্যে মধ্যে মানবের ছায়া পতিত হইতেছে,—বুঝিলেন যে তাহা পাপিষ্ঠা মোক্ষদার ছায়া, তাঁহার বৃদ্ধ বয়সের বনিতা-রূপিনী কালভুজঙ্গিনীর পাপছায়া! মনে করিলেন পাপীয়সী তাহার প্রিয় সমাগমের বিলম্ব হেতু অধীর হইয়া গৃহমধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছে। তাঁহার হস্তে দন্ত সংঘর্ষিত

হইল, চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল, দেহ কম্পিত হইল। সেই বৃদ্ধের নিস্তেজ হৃদয় যৌবনের প্রবল বলে বলীয়ান্ হইল, তিনি বজ্রমুষ্টিতে ভোজালিয়া ধারণ করিয়া ভাবিলেন "না হয় উহাকেই শেষ করি"—আবার ভাবিলেন "না না—আগে তাহাকে পরে যেরূপ বিবেচনা হয় করা যাইবে।"

গোপাল আবার নিস্তব্ধভাবে বসিয়া রহিলেন।

এদিকে মোক্ষদা যে দাসী পাঠাইয়া, গোপালের বৃক্ষতলে আসিবার অনেক পূর্ব্বে বিজয়কে আপন কক্ষে আনাইয়াছে, তিনি তাহার বিন্দুমাত্র অবগত নহেন। তিনি পথ চাহিয়া আছেন, আসিলেই এক আঘাতে তাহার জীবন লীলা শেষ করিবেন। কিন্তু গোপাল চন্দ্র ঘোর প্রতারিত হইয়াছেন; তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝি সফল হইল না।

গোপাল নিভৃতে বসিয়া আছেন, এমত সময়ে দূরে কাহার মৃদু পাদবিক্ষেপ শব্দ হইল, তিনি অস্ত্র লইয়া সতর্ক হইলেন, শব্দ রজনীর ঘোর নিস্তব্ধতায় বোধ হইল ক্রমশ নিকটবর্ত্তী হইতেছে। গোপাল তাঁহার দক্ষিণ দিকে দেখিলেন,—কে আসিতেছে; সেই অন্ধকার রাত্রে আগন্তুকের শুভ্র বসন তাঁহার নয়ন গোচর হইল। গোপাল বুঝিল—আর কে,—তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে যেন তাড়িত বেগে শোণিত সঞ্চারিত হইল, চক্ষু স্থির ও পলক বিহীন হইল, প্রতিকেশ পর্য্যন্ত যেন আপনাপন স্থানে দণ্ডায়মান হইল। আগন্তুক নিকটবর্ত্তী—ক্রমশঃ সম্মুখবর্ত্তী হইল,—গোপাল লম্ফপ্রদান পূর্ব্বক তাহাকে আক্রমণ করিয়া সেই শাণিত ভোজালিয়ার আঘাত করিলেন।

লোকটী "বাপরে" বলিয়া চিৎকার করিয়া ধুলি বিলুণ্ঠিত

হইয়া ছট্ ফট্ করিতে লাগিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে অপর দুইজন ব্যক্তি "কি করিলে, কি করিলে, মহারাজকে হত্যা করিলে" বলিয়া গোপালকে ধরিয়া ফেলিল।

গোপাল ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন, পরে চিৎকার করিয়া বলিলেন "আঁা কাকে কাট্‌তে কাকে কাট্‌লাম, আমার শত্রু মরিল না, যে আমার জীবনের সুখ নষ্ট করিতেছে, আমার হৃৎপিণ্ড খাঁক করিতেছে, তাহার নিপাত হইল না।"

গৃহমধ্যে মোক্ষদা স্তম্ভিত হইল, বিস্ময় বেগে আলোক লইয়া বহির্গত হইয়া সেই ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইল। লজ্জা সরম দূরে গেল, বিজয় পিতৃপদে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিল। মোক্ষদা চাহে হইল—দেখিতে;

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

বৈপরীত্য।

উমাচরণের বামহস্ত একেবারে দেহ হইতে বিচ্যুত হইয়াছে, অনর্গল শোণিতস্রাব হইতেছে—তাহার মূর্চ্ছা হইয়াছে, বিজয়চন্দ্র উমাচরণের এতাদৃশ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই চিকিৎসককে ডাকিয়া আনিতে বলিলেন।

বিজয় পিতার অবস্থা দেখিয়া ক্রমে রাগে অধীর হইলেন। গোপালকে তখনও দুইজন লোকে ধরিয়া আছে, ভোজালিয়া নিকটেই পড়িয়া আছে। বিজয় আর কোন কথা না কহিয়া সেই ভোজালিয়া দ্বারা গোপালের গলদেশে সজোরে আঘাত করিলেন। গোপালের মস্তক দেহ হইতে প্রায় বিচ্ছিন্ন হইল, গলার কাছে অল্প মাত্র লাগিয়া রহিল। গোপালের মৃত দেহ ভূমিতে পড়িয়া সজোরে ছট ফট করিতে লাগিল। গলদেশ হইতে ফোয়ারা দিয়া রক্ত বহির্গত হইতে লাগিল, জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িল, চক্ষু স্থির হইল।

এই গোলযোগ হইবা মাত্রেই দাসী বাটী ছাড়িয়া পলাইয়াছিল, সে ভাবিল আমি বিজয় বাবুকে ডাকিয়া আনিয়া না জানি কি দুষ্কর্ম্মই করিয়াছি। কত দেব দেবীর নিকট কতই মানসিক করিল; সে মানসিকের এক আনা অংশ দিবারও তাহার ক্ষমতা ছিলনা।

মোক্ষদা এই সময়ে ছাতের উপরে ছিল, সে এই ঘটনা দেখিয়া "বিজয় কি কর্‌লে, আমার সর্ব্বনাশ কর্‌লে" বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল।

বিজয়চন্দ্র একবার ছাদের দিকে তাকাইলেন মাত্র, কোন উত্তর দিলেন না। উমাচরণের সমভিব্যাহারী একজন লোক বলিলেন "চিৎকার করিবেন না, বাবু বাঁচিয়াছেন, আপনার ভয় নাই।"

মোক্ষদার মৌখিক চিৎকার থামিল।

ক্ষণেক পরে উমাচরণের জ্ঞান হইল, তিনি দেখিলেন

যে গোপালকে কে হত্যা করিয়াছে, জিজ্ঞাসিলেন "এ কার্য্য কে করিয়াছে ?"

সমভিব্যাহারী বলিল "বিজয় বাবু।"

উমা। বিজয় কোথায় ?

তখন বিজয় তাঁহার নিকটেই দণ্ডায়মান, লোকটী বলিল "আপনার সম্মুখে।"

উমা। বিজয়, এ কার্য্য কেন করিলে ? একে নিজের যন্ত্রণায় অস্থির হইতেছি, আবার তোমার চিন্তা আসিল। নবাব জানিতে পারিলে কি তোমায় দণ্ডিত করিবেন না।

একটী লোক বলিল "মহাশয় সে বিষয়ে চিন্তিত হইবেন না, এ কথা কেহ জানিতেও পারিবেনা। কেবল গোপালের স্ত্রী জানে, তাহাকে বাধ্য করা যাইবে।"

উমা। সে শুনিবে ?

বিজয়। শুনিবে।

লোকটী পুনরপি বলিল "আমরা রটনা করিব যে কোন শত্রুপক্ষীয় লোকে গোপালকে হত্যা করিয়াছে, মহারাজকে আঘাত করিয়াছিল তবে দৈবানুগ্রহে কেবল মাত্র একটী তন্তু ছিন্ন হইয়াছে, জীবনের কোন ভয় নাই।"

উমা। আমি কি বাঁচব ?

লোক। কেন বাঁচিবেন না।

উমা। বিজয়! এ সমস্ত কেবল তোমার জন্যই হইয়াছে, গোপাল একদিন আমার নিকট এ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করায় আমি তোমায় বলিয়াছিলাম, বোধ হয় স্মরণ আছে; কিন্তু তুমি আমার পায়ে হাত দিয়া শপথ করিয়াছিলে যে সে সমস্তই মিথ্যা। আমি

আর কোন কথা বলি নাই। পুনরায় শুনিলাম, এবং সেই জন্য সত্য মিথ্যা জানিতে আসিয়া আমার এই দশা।—জল আছে কি?

বিজয় দৌড়িয়া যাইয়া গোপালের বাটী হইতে জল আনিল। আসিবার কালে মোক্ষদা বলিল "শুনিয়া যাও।"

বিজয়। আমি এখনি আসিতেছি।

উমাচরণ জল পান করিতেছেন। এমত সময়ে চিকিৎসক আসিয়া উপস্থিত হইল। বাটীতে সংবাদ গয়াছিল, বাটী হইতে লোক জন ও শিবিকা আসিল। উমাচরণকে শিবিকা করিয়া বাটীতে লইয়া যাওয়া হইল। সকলেই শুনিল যে কোন শত্রু লোক এ কার্য্য করিয়াছে। লোকের জনতা দেখিয়া মোক্ষদা বিনাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

নবাভিনয়।

—০—

উমাচরণ শিবিকায় উঠিয়া বলিলেন "বিজয় যে বিষয় ঠিক করিয়া আইস, নতুবা আমার প্রাণ অস্থির হইতেছে।"

বিজয়। তবে আপনারা যান। আমি সমস্ত ঠিক করিয়া পরে যাইতেছি।

তাঁহারা সকলে গৃহে গেলেন, কতকগুলি লোক গোপালচন্দ্রের শব সৎকার করিতে গেল। মোক্ষদাকে স্বামীর মুখাগ্নি করিতে আর কেহ ডাকিল না। গোপালচন্দ্রের লাশ চালান

হইলে বিজয় মোক্ষদার গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মোক্ষদার গগনভেদী ক্রন্দনধ্বনি থামিল।

পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে এপর্য্যন্ত কি মোক্ষদাকে শান্তনা করিতে প্রতিবেসিনী কেহই আসে নাই?—আমরা বলি না। উমাচরণ বাবু যে কি প্রকার শান্ত স্বভাবসম্পন্ন লোক ছিলেন, তাহা বোধ করি সকলেই অবগত আছেন; সুতরাং এ রাত্রে আসিয়া একটী বিপদ ঘটাইবার আবশ্যক নাই ভাবিয়া কেহই আসে নাই।—

মোক্ষদা বিজয়ের নিকটে আসিয়া বলিল "তুমি কি করিলে, এখন আমার দশায় কি হবে?"

বিজয়। কেন?

মোক্ষদা। আমি কোথায় দাঁড়াইব?

বিজয়। যেখানে দাঁড়াইয়া আছ।

মোক্ষদা। এ পরিহাসের সময় নয়।

বিজয় দেখিল মোক্ষদা লোক মন্দ নয়! সুতরাং বলিলেন "যেমন ছিলে তেমনি থাকিবে, আমি তোমার সমস্ত খরচ পত্র দিব।"

মোক্ষদা। আমার যাহা আছে তাহাতে এমন বোধ হয় না যে তোমার সাহায্য লইতে হইবে।

বিজয়। তবে কি?

মোক্ষদা। কে আমায় দেখিবে?

বিজয়। আমি।

মোক্ষদা। কে আমার কাছে থাকিবে?

বিজয়। আমি।

মোক্ষদা। তুমি কখন কোথায় থাকিবে তাহার স্থির নাই—কিন্তু আমি যে বিরহিনী পাগলিনী, আমি যে নয়নে নয়নে চাই।

বিজয়। তাহাই পাইবে।

মোক্ষদা। কয় দিন?

বিজয়। যত দিন বাঁচিব।

মোক্ষদা। ইহার পর যদি তুমি আমায় দূর করিয়া দাও তবে কোথায় যাইব?

বিজয়। তোমার ত অভাব নাই—

মোক্ষদা। আমার অর্থের অভাব নাই সত্য, কিন্তু তোমার প্রেমের ত অভাব আছে।

বিজয়। আমি শপথ করিতেছি যে আমি চিরদিন তোমার একান্ত অনুরক্ত থাকিব।

মোক্ষদা। পুরুষের শপথে বিশ্বাস কি?

বিজয়। তবে কিসে বিশ্বাস হইবে?

মোক্ষদা। বলিতেছি;—তুমি বিবাহ করিবে?

বিজয়। সে সব কথা এখন কেন?

মোক্ষদা। এখনি আবশ্যক।

বিজয়। তুমি যাহা বলিবে, তাহাই করিব।

মোক্ষদা। আমার কথা শুনিবে তাহাতে বিশ্বাস কি।

বিজয়। কিসে বিশ্বাস হয় কর।

মোক্ষদা। আমি বলিলে তুমি বিবাহ করিবে?

বিজয়। করিব।

মোক্ষদা। কাহাকে?

বিজয়। যাহাকে বলিবে।

মোক্ষদা। এই গুলি সমস্ত মিথ্যা, যাহার বিবাহের এত সাধ, সে যে আমি যাহাকে বলিব তাহাকে বিবাহ করিবে তাহা কি কখন বিশ্বাস হয়?

বিজয়। কেন হইবে না মোক্ষদা।

মোক্ষদা। তবে বলি?

বিজয়। বল।

মোক্ষদা। শুনিবে?

বিজয়। শুনিব।

মোক্ষদা। আমার মাথা ছুঁইয়া বল শুনিবে।

বিজয় তাহাই করিলেন।

মোক্ষদা। আমায় বিবাহ কর।

বিজয় নিস্তব্ধ হইলেন. মুখে আর কথা ফুটিল না।

মোক্ষদা। কথা নাই যে?

বিজয়। এ বিষয় পরে বলিব।

মোক্ষদা। পরে কেন?

বিজয়। বাবাকে জিজ্ঞাসা করিব না।

মোক্ষদা। তিনি যদি অসম্মত হন।

বিজয়। তিনি অসম্মত হইবেন না।

মোক্ষদা। তবে কর।

বিজয়। তাহাই করিব?

মোক্ষদা। কাল করিবে?

বিজয়। না হয় কিছু দিবস পরেই হইবে।

মোক্ষদা। না বিজয় তাহা হইবে না, যদি তুমি আমায়

কাল রাত্রের মধ্যে বিবাহ কর তবেই উত্তম, নতুবা আমি নবাব বাহাদুরের দরবারে জানাইব যে তুমি আমার স্বামীকে হত্যা করিয়াছ। আমি অন্য কোন প্রস্তাবে সম্মত হইব না।

বিজয়। বিধবা বিবাহ কি আছে?

মোক্ষদা। না থাকে হইবে।

বিজয়। তুমি ত বন্ধ্যা, কে আমার বিষয় সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইবে?

মোক্ষদা। কে বলিল আমি বন্ধ্যা? আমি তিন মাস গর্ভবতী—আমি আজ এক বৎসর স্বামীর নিকট শয়ন করি নাই; আমার পুত্র হউক, কন্যা হউক, ইহা তোমারই ঔরস জাত। তোমার সন্তান তোমার বিষয়ের অধিকারী না হইয়া আর কে হইবে?

বিজয় নির্ব্বাক নিষ্পন্দ।

মোক্ষদা। বিজয় উত্তর দাও, চুপ করিলে চলিবে না, আমি তাহা শুনিব না, আমার গর্ভ না হইলে আমি এত জিদ্ করিতাম না। তোমার ঔরস জাত সন্তান হইয়া আমার গর্ভের দোষে কি সে এই পর্ণকুটীরের উত্তরাধিকারী হইবে? না বিজয়, না, না,—আমি প্রাণ থাকিতে তাহা সহ্য করিতে পারিব না।

বিজয়। কাল ইহার উত্তর দিব।

মোক্ষদা। উত্তম, কিন্তু মনে রাখিও যে কাল শেষ দিন, হয় কাল আসিয়া সুসংবাদ দিবে, নতুবা পরশ্ব প্রাতে আর আমার এখানে দেখিতে পাইবে না। কুলকামিনী হইলেও

অপরিচিত বিধর্ম্মী বিচারকের সম্মুখে উপস্থিত হইতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হইব না। এখন যাও।

বিজয়। কেন থাকিলেই বা।

মোক্ষদা। আমার বাটীতে এ সম্বন্ধে আর থাকা হইবে না, নূতন সম্বন্ধ চাই, হয় এ বাটী তোমার হইবে, তোমার বাটি আমার হইবে; আমি তোমার হইব, তুমি আমার হইবে, নতুবা এই শেষ, আমাকে শত্রু বলিয়া জানিও।

বিজয় অগত্যা ধীর পাদ বিক্ষেপে বিমর্ষ ভাবে গৃহাভি-মুখে গমন করিলেন। মোক্ষদা কুন্দ দন্তে অধর টিপিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনি কম্পিত করিয়া বলিল "এই আমার একদিন!"

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

হরিষে বিষাদ।

এই ঘটনার পর দিবস সন্ধ্যার অনেক পূর্ব্বে মোক্ষদা উত্তম করিয়া বেশ বিন্যাস করিল। তাম্বুল রাগে ওষ্ঠধর রঞ্জিত করিয়া বসনাঞ্চল দ্বারা ওষ্ঠের কোণ দুটী মুছিয়া বলিল "ও চিন্তে।"

দাসী। কেন মা।

মোক্ষদা। কি কর্‌চিস্‌?

দাসী। এই শল্‌তে পাকাচ্চি।

মোক্ষদা। চের শল্‌তে আছে, আর শল্‌তে পাকাতে হবে না, এদিকে আয়।

দাসী আসিল।

মোক্ষদা। কাল যখন এলি, তখন রাত কত?

দাসী। কে জানে মা, বিজয় বাবু বেরুচ্চে এমন সময় আমি এলাম।

মোক্ষদা। আচ্ছা বিজয়ের সঙ্গে যদি আমার বে হয় তা হলে তুই খুসী হস্?

দাসী। তা কি হয়!

মোক্ষদা। হয় কি না, এখনি টের পাবি।

দাসী। সে কি গো রাঁড় মানুষের বিয়ে হবে?

মোক্ষদা। ইচ্ছে হলেই হয়।

দাসী। লোকে বল্‌বে কি?

মোক্ষদা। লোকের কথায় ত আর আমি পচে যাব না।

দাসী। তা বটে, আর বড় ঘরের কথা বলেই বা কে? তা হলে কবে বে হবে?

মোক্ষদা। আজ।

দাসী। আজ্ কি, মার আমার সব আজ্‌গুবি কথা।

মোক্ষদা। কেন?

দাসী। এক বছর বুঝি বিয়ে কর্‌তে আছে।

মোক্ষদা। শাস্তর যে তোর মুখস্থ—আচ্ছা চিরুণে আমায় কেমন দেখাচ্ছে?

দাসী। বেশ!

মোক্ষদা। 'বেশ কেমন বল?

দাসী। তা আবার কি করে বল্‌ব।

মোক্ষদা। মুনির মন টলানি গোছ না কি তাই বল

দাসী মনে মনে বলিল "আ মরণ, এই রূপে মুনির মন টলাবেন, কি জন্যে যে বিজয় বাবুর মন টলেছে তা তিনিই জানেন, আ মলো মাগী আবার বলে যে বাবু ওকে বিয়ে কর বে, অমন তর দশ বিশটে তাঁর চাকরাণী আছে। ছুড়ি ক্ষেপ্‌ল নাকি,—এমন বুকের পাটা কখন দেখিনি মা। সোয়ামী মলো তা একবার গাঁ গাঁ করে চেঁচিয়ে, সব ঠাণ্ডা— আজ আবার মাথা বেঁধে বলে বিয়ে কর্‌ব। ভাগ্যি পাড়ার লোক এ বাড়িতে আসে না, তাই রক্ষে, নইলে নিন্দের জাঁ'ব কাণ পাত্‌বার যো থাক্‌ত না।"

মোক্ষদা। কি লো, হাঁ করে কি দেখ্‌ছিস?

দাসী। এই তোমাকেই দেখ্‌ছি।

মোক্ষদা। আচ্ছা কেমন ফের্‌তা দিয়ে কাপড় পরেছি, দেখ।

দাসী। বেশ।

মোক্ষদা। আ মরণ, সবই বেশ—.

দাসী। তা কি বল্‌ব?

এমন সময় বহির্ব্বাটীতে কিসের শব্দ হইল। দাসী বলিল "কে গা?"

"দোয়ার খোল্‌।"

দাসী। তোমরা কারা গা?

উত্তর। রাজবাড়ির লোক।

মোক্ষদা শশব্যস্তে বলিল "খোল খোল্‌ দোয়ার খোল্‌।"

মোক্ষদা মনে মনে ভাবিল যে তাহারা বুঝি তাহাকে লইতে আসিয়াছে।

দাসী দরজা খুলিয়া দিবা মাত্র প্রায় পঁচিশ জন লোক বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। দুই জনে উত্তম করিয়া মোক্ষদাকে বাঁধিল।

মোক্ষদা রাগ ভরে বলিল "আমায় বাঁধ্‌ছ কেন?"

লোক। কাল নায়েব মশায়কে খুন করেছ, রাজার হাত কেটে দিয়েছ, আবার বাঁধছি কেন? চল্‌ হারামযাদি, কাজি তোর মাথা নেবে জানিস্‌ নে।

মোক্ষদার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার যত আশা সকলই ফুরাইল, বেশ বিন্যাস বৃথা হইল। হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল!

মোক্ষদা বলিল "আমায় ছাড়িয়া দাও, আমি আর কিছু চাহি না।"

লোক। উঁনি করলেন খুন, আর আমরা দি ছেড়ে, কি সুখ রে, চল্‌ না, কাজি ছেড়ে দেবে এখন।

মোক্ষদা দেখিল ঘোর বিপদ! উপায়ান্তর নাই—ভাবিল "ইহারা আবার আমার বিপক্ষে সাক্ষ্য দিবে, কেন এমন কুকর্ম্ম করিয়াছিলাম, এখন উপায়? একবার বিজয়কে দেখিতে পাইলেও যে হয়, তাহার পায় ধরি, তা সেই বা কোথা?

মোক্ষদা বলিল "কুমার বাহাদুর কোথায়?"

লোক। সে খোঁজে কাজ কি, এখন ভালয় ভালয় চল্‌, নইলে টেনে নিয়ে যাব।

একজন লোক দাসীর প্রতি চাহিয়া বলিল "এ মাগি কেরে?"

দাসী এতক্ষণ কাঁপিতেছিল, বলিল "বাবা আমি বাড়ির ঝি।"

লোক। শালা বেটী—

"হ্যাঁ যাই বাবা" বলিয়া দাসী ছুটিল, যাইবার কালে মনে মনে বলিল "ছুঁড়ি ভাল বিয়ে করলি রে।"

একটী স্ত্রীলোক রাস্তা দিয়া যাইতেছিল, সে চিন্তে দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল "ওখানে কি গা?"

দাসী সেকথা শুনিতে পাইলনা—কম্পিত স্বরে তাহার মুখ পানে চাহিয়া বলিল "কি গায় হলুদের ঘটা মা।"

স্ত্রীলোক। কার গো?

দাসী। ঐ ছুঁড়ির—(মুখভঙ্গি করিয়া) মুকিব—মুকিব: যাওনা ওদিগে, দেখগে, রাজবাড়ির লোকেরা রাস্তার লোক ধরে ধরে তেল হলুদ দিচ্ছে।

স্ত্রীলোক। বল কি?

দাসী। ওগো হাঁ হাঁ, আমায় আর বকিও না, আমার টাকরা শুকিয়ে গেছে—

স্ত্রীলোক। তুমি কাঁপছ কেন?

দাসী। দেখনা গিয়ে।

এমত সময়ে দেখিল রাজবাড়ীর লোকেরা মোক্ষদাকে বন্ধন করিয়া লইয়া আসিতেছে।

দাসী "ও বাবা আবার ঘড়া দিতে যাব রে" বলিয়া উদ্ধশ্বাসে ছুটিল, স্ত্রীলোকটী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল।

——

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—:০:—

দুঃখাবসান।

বিরজার দুঃসহ অন্ন কষ্ট ঘুচিয়াছে, এ সংবাদ পাঠক পাইয়াছেন, কিন্তু তাহার পর অভাগিনীর কি হইয়াছে তাহা অবগত নহেন।

মহারাজ অম্বিকাকে আনিতে লোক পাঠাইলেন, কিন্তু নবাবের লোক তাহাকে ছাড়িয়া দিল না, সুতরাং তিনি কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া একাকী নবাব সিরাজ উদ্দৌলার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।

নবাব বাহাদুরের নিকট মহারাজের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল, এবং তিনি তাঁহাকে তৎকালে বিশেষ স্নেহ করিতেন। নবাব বাহাদুর মহারাজকে যথেষ্ট সম্মাননা সহকারে অভ্যর্থনা করিলেন। মহারাজও নবাবকে যথারীতি অভিবাদন পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিয়া নানা প্রকার কথোপকথনের পর অম্বিকার কথা উত্থাপন করিলেন, এবং তাহার অনুপূর্ব্বিক সমস্ত জীবন বৃত্তান্ত বিবৃত করিলেন।

নবাব বিরজার স্বামী-ভক্তি ও পাতিব্রত্য দর্শনে মুগ্ধ হইলেন, এবং তৎক্ষণাৎ অম্বিকাকে অব্যাহতি দিবার আদেশ দিলেন। তিনি মহারাজকে বলিলেন যে, এরূপ কঠোর নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচারের বিষয় তিনি কিছুই অবগত নহেন।

নবাব কাজিকে ডাকাইয়া যৎপরোনাস্তি ভৎর্সনা করিলেন, অম্বিকার বিচার তিনি স্বয়ং করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, যে পর্য্যন্ত না তাঁহার বিচার শেষ হয়, সে পর্য্যন্ত কাজি নজর বন্দিতে থাকে এই আদেশ দিলেন।

উমাচরণ ও তৎপুত্র বিজয়চন্দ্রের উপর গ্রেপ্তারি পরওয়ানা গেল। এবং বিচারের দিন নির্দ্দিষ্ট হইল।

যে দিন রাত্রে গোপালচন্দ্র কর্ত্তৃক উমাচরণের হস্ত কর্ত্তিত হয়, তাহার পর দিন এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। মোকদ্দমা মুর্শিদাবাদে পাঠাইবার কিয়ৎকাল পরেই পরওয়ানা লইয়া নবাবের লোক নন্দনপুরে পৌঁছিল।

নবাবের লোকদিগের পৌঁছিবার অল্প পূর্ব্বেই উমাচরণের মৃত্যু হইয়াছে—তাহারা দেখিল রাজার লোকেরা মহাসমারোহে উমাচরণের শবসৎকার করিতে যাইতেছে। নবাবের লোকেরা তাহাতে প্রতিবন্ধকতা করিয়া তৎক্ষণাৎ শব মুর্শিদাবাদে চালান দিল, এবং বিজয়কে দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া প্রহরী বেষ্টিত হইয়া লইয়া আসিল।

গ্রেপ্তার কালে বিজয় জিজ্ঞাসা করিল "কি অপরাধে গ্রেপ্তার করিতেছ?"

প্রহরী। জানি না—নবাব বাহাদুরের হুকুম আমরা তামিল করিতেছি মাত্র।

বিজয় আর কোন কথা কহিল না,—সেই রাত্রেই তিনি তাহাদের সহিত আসিতে বাধ্য হইলেন। তখন বিজয়ের মনে যে কত প্রকার ভাবের উদয় হইতেছিল তাহা বলা যায় না। কিন্তু মনুষ্যের সকল সময় সে ভাব মনে

থাকে না। অম্বিকাকে অন্যায়রূপে কত কষ্ট দিয়াছে, এখন তাহা মনে হইল, এবং কথঞ্চিৎ অনুশোচনারও উদ্রেক হইল। কিন্তু এখন যদ্যপি বিজয় অব্যাহতি পায়, তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি যে সেই দণ্ডেই, সে সমস্ত বিস্মৃত হয়। আজি দৈবদুর্বিপাকে বিজয়কৃষ্ণের নিয়তি চক্র ঘুরিয়াছে, বিজয় তাহার ফল ভোগ করিতে চলিল।

ক্ষমতাপন্ন মনুষ্য যখন অপরের উপর কোন প্রকার অত্যাচার বা গর্হিত কার্য্য করে, তখন যদ্যপি চিন্তা করে, যে অপরে যদি তাহার প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করে তাহা হইলে তিনি কি দুঃখিত হন না? বস্তুত তাহা হইলে আর অত্যাচার হয় না। মনুষ্য আপনা হইতে আপনি সংক হইয়া যায়, কিন্তু মানব তাহা করে না, ক্ষমতা কালে ক্ষমতানু-যায়ী বা ততোধিক কার্য্য সম্পাদন করিতে একেবারে বাহ্য-জ্ঞানশূন্য হইয়া যায়, পশু ভাব সম্পন্ন হইয়া উঠে;—ইহাই মনুষ্যের অধঃপতনের সূত্র; কিন্তু তাহার ফলভোগ অবশ্য-ম্ভাবী। আজি হউক, কালি হউক, সে ফলভোগ করিতেই হইবে, আজি বিজয় চন্দ্র ঈশ্বরের সেই অপক্ষপাতী নিয়মের অধীন হইয়া আপন পূর্ব্বকৃত অত্যাচারের ফলভোগ করিতে চলিল।

যথা সময়ে বিজয় প্রহরী পরিবেষ্টিত হইয়া মহানগরী মুর্শিদাবাদে পৌঁছিল। যথা সময়ে নবাব বাহাদুর অম্বিকা-চরণের ন্যায্য বিচার করিলেন। এত দিন পরে অম্বিকার ভাগ্য প্রসন্ন হইল। এত দিনে চির অভাগিনী বিরজার মনোদুঃখ ঘুচিল। এত দিনে বিজলী মন খুলিয়া হাসিল!

এত দিনে বালক বিভুতি ভূষণ পিতৃ স্নেহের অতুল সুখ পাইল। বলা আবশ্যক যে চিকিৎসকের বিচিত্র ক্ষমতা প্রভাবে ও অত্যাচারের অবসানে, অম্বিকাচরণের বিকৃত ভাব তিরোহিত হইয়াছে, তিনি অবার পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

মহারাজের চেষ্টা সফল হইল, মহারাণীর আশ্রয় দানের ফল হইল, তাঁহার মনের মত কার্য্য হইল। সিরাজউদ্দৌলার শত পাপের কতকটা প্রায়শ্চিত্ত হইল, তাহার যম যন্ত্রণার হয়ত কতকটা লাঘব হইল।

পাঠক! এই সময়ে আপনাকে বিজলী সম্বন্ধে গুটী কত কথা বলিব।—বিজলী বাল্যাবস্থাতেই পিতৃ মাতৃ হীনা, দশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় গ্রামস্থ দয়াবান লোকদিগের সাহায্যে বিবাহিতা হইয়া, প্রায় চারি বৎসর কাল, স্বামী সহবাস সুখে যাপন করেন। বিজলীর স্বামী একদিন সহসা নিরুদ্দেশ হইলেন, কোথায় গেলেন, কি হইল, এ সংবাদ কেহই পাইল না। সেই পর্য্যন্ত বিজলী স্বামী মুখ দেখে নাই।

বিজলী বিরজার বাল্য সখী, বিজলীর এই আকস্মিক বিপদে, বিরজা মর্ম্মপীড়িতা হইয়া, তাঁহাকে আপন গৃহে আশ্রয় দিলেন, এবং তাঁহাকে অকৃত্রিম স্নেহ সহকারে সহোদরার ন্যায় যত্ন করিতে লাগিলেন। বিজলী যে বিরজাকে প্রাণে প্রাণে ভালবাসিত, সে কথা আর বলিবার আবশ্যক নাই। সেই পর্য্যন্ত বিজলী বিরজার নিকটেই আছেন।

———

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

—•*•—

পরিশিষ্ট।

বিরজা পিতৃবিয়োগ সংবাদ শ্রবণে বড়ই ব্যথিতা হইল। অম্বিকা ও বিজলী কত যত্নে বিরজাকে শান্তনা করিলেন। অম্বিকা এখন বিরজার নিকট স্বীয় পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য কতই ক্ষমা প্রার্থনা করেন। তাঁহার পূর্ব্বাবস্থার কথা স্মরণ করিয়া কতই লজ্জিত ও দুঃখিত হন। অম্বিকা পূর্ব্ব কথা পাড়িলেই বিরজা তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন, কিন্তু বিজলী ছাড়িত না,—সে মধ্যে মধ্যে অম্বিকাকে হাসিতে হাসিতে কত কথা বলিত অম্বিকা থাকিতে পারিতেন না, কাঁদিয়া ফেলিতেন। বিরজা বিজলীকে ভৎর্সনা করিলে, বিজলী উত্তর দিত, "আমরা কত কেঁদেছি, উনি কি একদিন কাঁদ্‌তে পারেন না।"

উমাচরণের গলিত মৃত দেহের দাহ হইল। বিজয়ের তিন শত বেত্রাঘাত হুকুম হইল, বেত্রাঘাত সহ্য করিয়া যদি বাঁচে তাহা হইলে কুক্কুর দ্বারা আহার করাইয়া তাহার প্রাণ বিয়োগ করা হইবে।

বিজয় তিন শত বেত্রাঘাতের নিদারুণ যন্ত্রণা সহ্য করিতে পারিল না। তাহাতেই তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল। ইহ সংসারের একটি কণ্টক ঘুচিল!

বিজয়ের সমস্ত সম্পত্তি নবাব বাহাদুরের খাস হইল। তিনি বিরজার উপর বিশেষ প্রীত হইয়া তাহার চতুর্থাংশ তাঁহাকে দিলেন, এবং পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিবার আদেশ রহিল।

বিজয়চন্দ্রের বাটী ও আসবাব ইত্যাদি অম্বিকাচরণ পাইলেন।

উমাচরণের পত্নীর মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইল।

মোক্ষদা অব্যাহতি পাইল। বিরজা তাহাকে আপন আবাসে লইয়া গেল। মোক্ষদা আজি হইতে সংসার চিনিল, আপনার চরিত্রের বিষয় ভাবিয়া কতই লজ্জিত হইল।

মহারাণী বিভূতিভূষণকে নিজে একটী বাটী ও কতক ভূসম্পত্তি জায়গীর স্বরূপ দান করিলেন।

অম্বিকা মহারাজ ও মহারাণীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া সপরিবারে নন্দনপুরে যাত্রা করিলেন।

সেই পর্য্যন্ত আর কেহ কখন মোক্ষদার চরিত্রের কোন দোষ দেখে নাই—মোক্ষদা বিরজাকে আপন কন্যার ন্যায়, বিভূতিকে দৌহিত্রের ন্যায়, অম্বিকাকে জামাতার ন্যায়, এবং বিজলীকে প্রিয় সখীর ন্যায় ভালবাসিতে লাগিল, তাহার জীবনের যেন একটি যুগান্তর হইল।

কিছু দিবস পরে বিজলীর নিরুদ্দেশ স্বামীর উদ্দেশ পাওয়া গেল, তাঁহার রাজ দণ্ডে অন্যায় রূপে কারাবাস হইয়াছিল, মহারাজ বাহাদুরের অনুগ্রহে তাঁহারও অব্যাহতি হইল। বিজলী স্বামী পাইয়া পরম পুলকিতা হইল।

বিরজার আরও সন্তানাদি হইল। অম্বিকা কখন বা

নন্দনপুরে কখন বা সপরিবারে কৃষ্ণনগরে থাকিয়া রাজসহবাস সুখে ও বিরজার অতুল প্রেমে ডুবিয়া রহিল। এতদিনে বিষবৃক্ষে অমৃত ফল ফলিল!!!

সমাপ্ত।